পঞ্চম শারদ সংখ্যা

জেলার খবর সমীক্ষা

আশ্বিন ১৪১৮ অক্টোবর ২০১১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৩

প্রসঙ্গ দুর্গা ঃ

শ্রী শ্রী দুর্গাপূজার ইতিবৃত্ত
রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪

সিংহবাহনা দেবী সিংহবাহিনী
শিবেন্দু মান্না ৯

দুর্গোৎসবের মূলে অসাম্প্রদায়িকতা
দুঃখহরণঠাকুর চক্রবর্ত্তী ৭

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ

বেগম সুফিয়া কামাল
ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯

পুথির খোঁজে ঃ

কথকতার খোঁজে, পুথির খোঁজে, বেতড়ে
শ্যামল বেরা ১২

প্রবন্ধ ঃ

কলের গানের কথকতা
জহর চট্টোপাধ্যায় ১৫

বিচিত্র পেশা ঃ

মস্ত কলন্দর
সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ২২

নিবন্ধ ঃ

নামে কী আসে যায়
অলোককুমার মুখোপাধ্যায় ১১

আস্তিকতা - নাস্তিকতা
প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য ২১

রক্তবীজের বংশ
অমিতকুমার রায় ২৫

পুজোয় ঠাকুর ফেলা
সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ২৩

প্রবাদ নিয়ে দু'চার কথা ঃ

ছড়ায় মোড়া প্রবাদমালা
মালতি দাস ২৮

ভ্রমণীয় স্থানের কথা ঃ

জয় হোক কন্যাকুমারীকা
বিনয়শংকর চক্রবর্ত্তী ২৯

রম্য রচনা ঃ

রটনা নয় ঘটনা
কাজল সেন ২৬

গল্প ঃ

যে বাসা ভাঙল ঝড়ে
উত্তম কুমার পাল ২৪

অন্য শ্বশুরবাড়ী
অনিতা সেনগুপ্ত ৩০

ছড়া, কবিতা ঃ

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৩১
অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ৩২
নিমাই মান্না ৩০
চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র ২৫
অভিজিৎ হাজরা ২৭
সুদীপ কুমার চক্রবর্তী ২০
পূজা দাস ৩২
প্রণব কুমার দাস ২৭
পিয়ালী কুমার ৩০
তপন কুমার ভৌমিক ৩২
অনিতা ঘোষ ৩১
প্রতিম চ্যাটার্জী ২০

সম্পাদকীয়

এক টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দা, জঙ্গীহানার মারণ কামড়, ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি, হঠাৎ ভয়ানক ভূমিকম্প সহ নানাভাবে এক শ্রেণীর মানুষ ও প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা সৎ-সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকাটাকেই যেন বিদ্রুপ করছে। তবু আমরা আশায় বুক বাঁধি, এই অন্ধকার পরিস্থিতি কেটে যাবে। আমাদের বিশ্বাস, শুভবুদ্ধি, শুভ বিবেকের উদয় ঘটবে। ঠিক যেভাবে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে রুক্ষ শীতের শেষে বসন্তের আভাস আসে সেরকমই শরৎ আসে আর আসে দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজো মানে শক্তির পুজো -- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মিলন মেলা। আর দুর্গাপুজো মানেই নতুনের সমারোহ - নতুন গান, শারদ সাহিত্য। বাজার অগ্নিমূল্য, কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সব কিছুর খরচ বেড়েছে। তার উপর আছে লেখা পাওয়ার সমস্যা আর বিজ্ঞাপনের অপ্রতুলতা। খুব স্বাভাবিক, কারণ একে মফস্বলের কাগজ সার্কুলেশন কম, অন্যান্য ঝকমকে ছাপা পুজো সংখ্যার সঙ্গে তুলনাই চলেনা। তবু চেষ্টা করতেই হয় ভাল কিছু করার, পাঠকদের হাতে ভাল কিছু তুলে দেবার। এখনও পত্রিকার বেশ কিছু শুভানুধ্যায়ী আছেন তাই হাজারো বাধাবিঘ্ন সামলেও পুজো সংখ্যা সঠিক সময়ে বার করা গেল। কেমন হয়েছে তা পাঠকরাই বলবেন। আমাদের তরফে এটুকুই বলার আছে এ পত্রিকার পিছনে জড়িয়ে আছে বহু মানুষের আন্তরিকতা আর অযাচিত স্নেহের স্পর্শ।

মডার্ন ডিজিটাল স্টুডিও এ্যান্ড জেরক্স সেন্টার

প্রো ঃ বিমল দোলুই

জয়পুর মোড় (থানার নিকট) হাওড়া। ফোন- ৯৭৭৫১৩০৩২০

এখানে ভিডিও ফটোগ্রাফি, স্টীল ফটোগ্রাফি, মিক্সিং ও জেরক্স করা হয়।

৫ মিনিটে পাসপোর্ট ছবি পাওয়া যায়।

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

উন্নয়ন ও এলাকার মানবকল্যাণে ব্রত

ভাতেঘরী জনকল্যাণ সমিতি

ভাতেঘরী, থলিয়া, জয়পুর, আমতা - ২, হাওড়া - ৭১১৪০১

সম্পাদক - মানস কুমার মাজী

শিক্ষা ঃ সচেতনতা ঃ প্রশিক্ষণ ঃ সেবা ঃ রক্তদান

যোগাযোগ ঃ ৯৯৩২০০৭১৬১

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম

যাবতীয় বীমা সংক্রান্ত সমস্যা ও তথ্য সম্পর্কে জানার জন্য

যোগাযোগ করুন ঃ শঙ্কর চক্রবর্ত্তী

(কোড নং - ০৩৪১১৫৭৮ / ২২৮০৪৩)

ফোন ঃ ৯৭৩৪৪৭২৮৭৫

অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।

আপনার পরিবারের নিশ্চিত সুরক্ষার জন্য ভারত সরকার করেছেন ঘোষণা, জীবন সরল যোজনা।

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্ত্তী (৯৮০০২৮৬১৪৮) কর্তৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।

email : jelarkhabar@rediff.co.in

প্রচ্ছদ ঃ রাজস্থানী চিত্রে দুর্গা, প্রচ্ছদশিল্পী ঃ জহর চট্টোপাধ্যায়

মূল্য - ১০ টাকা

শ্রী শ্রী দুর্গাপূজার ইতিবৃত্ত

রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের এই বাংলাদেশে শরৎঋতু বিশেষভাবে সমাদৃত। ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুটি মাস নিয়ে শরৎকাল। ভাদ্রমাস হিন্দুদের নিকট একটি পবিত্র মাস। কারণ এই মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে মানবদেহ ধারণ করে আমাদের এই মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের কারণ সাধুব্যক্তিদের রক্ষা করা ও অসাধু ব্যক্তিদের বিনাশের জন্য এবং ধর্মকে স্থাপন করতে। জন্মাষ্টমী উৎসব এই কারণে শুধু বাংলাদেশে নয় সারা ভারতবর্ষে অতি পবিত্রভাবে পালন করা হয়।

আশ্বিন মাস আমাদের সকলের প্রিয় কারণ এই মাসে অনুষ্ঠিত হয় শারদোৎসব। বর্ষার পর প্রকৃতি যখন শ্যামলিমায় অপূর্ব রূপ ধারণ করে, শরতের সোনালী রোদে পূর্বদিগন্ত ভাস্বর হয়ে ওঠে এবং মাঠে মাঠে কাশফুলের ছটা তখনি মনে হয় যে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা আসন্ন।

রবীন্দ্রনাথও এই শরৎকালকে অপূর্বভাবে স্মরণ করেছেন। তাঁরই ভাষায় বলি ঃ

> ‘‘শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে
> আনন্দগান গা রে হৃদয় আনন্দগান গা রে।
> নীল আকাশের নীরব কথা শিশির ভেজা ব্যাকুলতা
> বেজে উঠুক আজি তোমার বীণার তারে তারে।।
> শস্যক্ষেতের সোনার পানে
> যোগ দেরে আজ সমান তানে
> ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে।।
> যে এসেছে তাহার মুখে দেখ্‌রে চেয়ে গভীর সুখে
> দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হয়ে যা রে।।’’

পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায় যে মেনকার একমাত্র কন্যা উমা দেবাদিদেব শিবকে পতিরূপে পেয়েছিলেন কঠোর তপস্যা করে, তখন তিনি পার্বতী নামে অভিহিতা ছিলেন। উমা শিবের সঙ্গে কৈলাসে বাস করেন এবং পতির বিনা অনুমতিতে কোথাও যান না। মা মেনকা তাঁর একমাত্র কন্যাকে দেখবার জন্য সারা বৎসর অধীরভাবে প্রতীক্ষা করেন এবং শরৎকাল উপস্থিত হলে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না, উমাকে আনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু শিবের অনুমতি পাওয়া খুব সহজ নয়। মেনকার একমাত্র পুত্র মৈনাক কৈলাসে গিয়ে গৌরীকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চান। কিন্তু শিব দক্ষের অপমানের কথা স্মরণ করে অনুমতি দিতে অসম্মত হলেন। তখন উমা এই বলে শিবের নিকট প্রার্থনা করলেন

> ‘প্রভু করি নিবেদন, পূজা লইবারে যাই পিতার ভুবন
> ষষ্ঠী আদি কল্প করি নবমীর দিনে
> কৈলাসে আসিব পুনঃ দশমী দিনে’

কাজেই অনেক সাধ্যসাধনা করে মাত্র তিনদিনের জন্য মা’র নিকট যাবার অনুমতি পান। আমাদের বাংলাদেশে কবিরা উমাকে কন্যারূপে দেখেছেন। সাধক কবি রামপ্রসাদ একটি গানে বলেছেন ঃ

> (গিরি) এবার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না
> বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না।
> যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
> মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া (তারে) জামাই বলে মানব না।

যাই হোক আমাদের মা দুর্গা শিবকে সন্তুষ্ট করে তাঁর পুত্রকন্যাদের নিয়ে তিনদিনের জন্য আমাদের এই মর্ত্যভূমিতে আসেন এবং চতুর্থদিনে আবার আমাদের ছেড়ে কৈলাসে চলে যান। কিন্তু এই তিন-চার দিনে আমাদের সকলের মন ভরে ওঠে এবং প্রতিদিনের জীবনযন্ত্রণা, রোগ, শোক ও বেদনা ভুলে গিয়ে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এই পূজায় অংশ গ্রহণ করে। তাই দুর্গাপূজা বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব এবং বাঙালী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বা বিদেশে যেখানেই থাকে সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজা।

কৃত্তিবাস রচিত বাংলা রামায়ণ অনুসারে রাবণ ও রাম উভয়ে দেবীভক্ত ছিলেন। দুর্গাপূজার মন্ত্রে আছে ‘‘রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালবোধিতা দেবী।’’ এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাল্মিকীর রামায়ণে দুর্গাপূজার কোন কথা নেই।

শারদীয়া দুর্গাপূজা কৃত্তিবাসের কল্পিত নয়। বহুকাল হতে বাংলাদেশে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদ অনুসারে রামচন্দ্র শরৎকালে দেবীর অকালবোধন করেন রাবণ বধের জন্য। কিন্তু কেন আমরা শারদীয় পূজাকে ‘অকালবোধন’ বলি? তার কারণ এই সময় হচ্ছে সূর্যের দক্ষিনায়ণ। দক্ষিনায়ণ কাল হচ্ছে দেবতাদের রাত্রি। দেবতারা তখন নিদ্রামগ্ন থাকেন। উত্তরায়ণ কাল হচ্ছে দেবতাদের দিন। তখন তাঁরা জেগে থাকেন। এই কারণে এই সময় দেবতাদের আরাধনার প্রশস্ত সময়। সেইজন্য রাবণ মহামায়াকে পূজা করেছিলেন বসন্তকালে। এইমতে বাসন্তীপূজাই প্রকৃত দেবীপূজা। রাবণকে বধ করার জন্য শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র পূজার জন্য মাকে জাগ্রত করেছিলেন শরৎকালে। অকালে বা দেবতাদের রাত্রিকালে রামচন্দ্র মাকে জাগ্রত করেছিলেন বলে একে ‘অকালবোধন’ বলা হয়।

মহাষষ্ঠীতে মায়ের বোধন হয় সায়াহ্নে বিল্ববৃক্ষ মূলে। বিল্ববৃক্ষে দেবীর বোধন কেন? বিল্ববৃক্ষকে বলা হয় শ্রীবৃক্ষ। দেবীদুর্গা, রাজ্যশ্রী

ও বিজয় প্রদায়িনী। প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীবৃক্ষকে দেবীর প্রতীকরূপে উপাসনা করা অসঙ্গত নয়। ষষ্ঠীর সায়াহ্নে বোধনের পরই হয় অধিবাস। পূজার পূর্বদিনের সম্পাদ্য কার্যকে অধিবাস বলা হয়। অধিবাসের প্রাথমিক পূজা বিল্ববৃক্ষমূলেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শ্রী শ্রী চন্ডী গ্রন্থে বলা আছে যে শরৎকালেই রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি দেবীর পূজা করেন। দেবী ভাগবতের মতে শরৎকালেই দুর্গাপূজার উৎপত্তি, কথিত আছে যে রামচন্দ্র দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য ১০৮ পদ্ম দ্বারা দেবীপূজার সংকল্প করেন। হিমালয়ে দেবীদহ বলে একটি হ্রদ আছে এবং শরৎকালে সেই হ্রদে ১০৮টি নীল পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। রামচন্দ্র তাঁর সেবক হনুমানকে পাঠিয়ে ঐ হ্রদ থেকে ১০৮টি পদ্ম সংগ্রহ করেন। দেবী ভক্তকে পরীক্ষা করবার জন্য ছলনা করে একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন। পূজার পূর্বের দিন দেখা গেল যে ১০৮ এর পরিবর্তে ১০৭টি পদ্ম রয়েছে। রামচন্দ্র অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে হনুমানকে আবার ঐ দেবীদহে পদ্ম আনবার জন্য পাঠালেন। কিন্তু ঐ হ্রদে শরৎকালে ১০৮টির বেশী পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না। কাজেই হনুমান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসে এই সংবাদ রামচন্দ্রকে জানালেন। পূজা পূর্ণাঙ্গ না হলে দেবী সন্তুষ্ট হবেন না এবং সংকল্প সিদ্ধ হবে না। তখন রামচন্দ্র নিজের একটি চক্ষু উৎপাটিত করে এটিকে পদ্মরূপে শ্রী শ্রী মায়ের চরণে অঞ্জলি দেবার সংকল্প করলেন। ধনুর্বাণ হাতে চক্ষু উৎপাটন করবার উপক্রম করতেই দেবী আবির্ভূতা হয়ে রামচন্দ্রকে অভীষ্ট বর প্রদান করলেন। এইজন্য রামচন্দ্র পদ্মলোচন নামে অভিহিত।

পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী এবং শ্রী শ্রী চন্ডীর বর্ণনা অনুযায়ী রাজা সুরথ সত্যযুগে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। সুরথ রাজার রাজধানী ছিল বর্তমানে বীরভূম জেলার বোলপুরে। চন্ডীতে যে বর্ণনা আছে তা থেকে জানা যায় যে রাজা সুরথ নিজ অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্রে যবনগণের হস্তে পরাজিত হয়ে রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন। আর সমাধি বৈশ্যকে তাঁর স্ত্রীপুত্রগণ ধনলোভে গৃহ থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। উভয়েই রাজ্য ও গৃহহীন হয়ে যখন ইতস্তত ভ্রমণ করছিলেন তখন দৈবক্রমে মেধস ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন এবং মুনির সঙ্গে কথোপকথন হয়। রাজ্যহারা হয়েও রাজা রাজ্যের কথা ভুলতে পারছেন না আর স্ত্রী পুত্রাদির নিকট অপ্রীতিকর দুর্ব্যবহার পাওয়া সত্ত্বেও সমাধি বৈশ্য তাদের প্রতি মমতাকৃষ্ট। মুনি বললেন ‘‘দেখ, মহামায়ার প্রভাবেই জীব এরূপ পথভ্রান্ত ও মমতাকৃষ্ট হয়। দেবীর এমনই প্রভাব যে তিনি জ্ঞানীদিগেরও চিত্তহরণ করেন। তিনিই সংসার বন্ধনের হেতু আবার প্রসন্না হলে তিনিই মুক্তিদাত্রী। তোমরা তাঁর উপাসনা কর, তবেই তোমাদের প্রত্যেকের অভীষ্ট লাভ হবে। মুনির এই উপদেশে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি নদীতটে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা দেবীর পূজা করেন। শ্রী শ্রী চন্ডী (ত্রয়োদশ অধ্যায়) অনুযায়ী তিন বৎসর এইরূপে সংযত চিত্তে দেবীর আরাধনার ফলে দেবী চন্ডিকা সন্তুষ্ট হয়ে উভয়কে দর্শন দান পূর্বক বরদান করতে চাইলে সুরথ চাইলেন হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধারভুক্তি - এই ভুক্তি লাভ করেন শ্রীরামচন্দ্র, অর্জুন প্রভৃতি। আর সমাধি চাইলেন তত্ত্বজ্ঞান - মুক্তি অর্থাৎ প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। দেবী বৈশ্যকে বললেন - তোমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে।

মহাভারতেও দেবী উপাসনার বিষয় উল্লিখিত আছে। ভীষ্মপর্বের ২৩তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দুর্গাদেবীকে প্রণাম ও প্রার্থনা করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। বারো বৎসর বনবাসান্তে এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্য যখন পান্ডবগণ বিরাটনগরে গমন করছিলেন তখন ঋষিদের পরামর্শে অজ্ঞাতবাসের সফলতার জন্য দুর্গাদেবীর স্তব করেন।

এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণে দুর্গাপূজার বিস্তৃত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। কালীবিলাসপুরাণেও শারদীয়া দুর্গাপূজার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

আমাদের এই বাংলাদেশে দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন করেছিলেন তাহেরপুরের (রাজসাহী জেলার অন্তর্গত) বারেন্দ্রবংশীয় রাজা কংসনারায়ণ। তিনি সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সমসাময়িক ছিলেন। কংসনারায়ণের পিতামহের নাম উদয়নারায়ণ ও পিতার নাম কুল্লুকভট্ট যিনি মনুসংহিতার টিকাকার ছিলেন। কংসনারায়ণকে বারেন্দ্রকুল গ্রন্থে ‘দ্বিতীয় বল্লাল সেন’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কংসনারায়ণ একজন সমৃদ্ধশীল রাজা ছিলেন। তিনি প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুর্গাপূজা করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সম্রাট আকবর তখন দিল্লীর অধীশ্বর। ভাদুরিয়ার রাজা জগৎনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাসন্তী পূজা করেছিলেন। তখন থেকেই বাংলাদেশের গ্রামের জমিদার বাড়ীতে দুর্গাপূজার ধূম লেগে যায় এবং এই কারণে ধনী হিন্দুর বাড়ীতে একটি করে চন্ডীমন্ডপ তৈরি হয়েছিল। পাঁচশ ভরি সোনা দিয়ে দুর্গাপূজা করতেন হুগলী জেলার ঢেঁকি গ্রামের জমিদার গঙ্গাধর কুমার।

দুর্গাপূজা যে চারদিনে অনুষ্ঠিত হয় তা পূর্বেই বলেছি। দুর্গা ষষ্ঠীর কথাও বলেছি। কিন্তু আসল পূজা আরম্ভ হয় সপ্তমী তিথি থেকে। সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকা স্থাপন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। নবপত্রিকাকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে না আনলে মায়ের সপ্তমী পূজা হয় না। অবগুণ্ঠনবতী নববধূর বেশে সজ্জিত শ্বেত অপরাজিতার লতা ও হলুদরঙের সূতা দিয়ে বাঁধা নবপত্রিকা শক্তির অধিষ্ঠান, কলা প্রভৃতি নয়টি বিভিন্ন গাছের চারা দিয়ে তৈরী করা হয়। এই নয়টি গাছের মধ্যে কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ব্রহ্মাণী, কচুর কালী, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর

কার্ত্তিকী, বেলের শিবা, ডালিমের রক্তদন্তিকা, অশোকের লোকরহিতা, মানকচুর চামুন্ডা ও ধানের লক্ষ্মী। গণেশের মূর্ত্তির পাশে নবপত্রিকা স্থাপিত হয় বলে সাধারণের ধারণা নবপত্রিকা গণেশের স্ত্রী এবং সকলেই একে 'কলাবউ' বলে থাকে। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। নবপত্রিকা হচ্ছে বিভিন্ন শস্যের পরিচায়ক। প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তবেই পূজা আরম্ভ হয়। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে 'মাটির প্রতিমায় মায়ের আবির্ভাব হয় আর মানুষের মধ্যে হবে না!' সপ্তমী পূজার পর হয় মহাষ্টমী পূজা। এই দিন সর্বাপেক্ষা শুভদিন বলে গণ্য হয়। মহামায়া বিশ্বব্যাপিনী হলেও নারীমূর্ত্তিতে তাঁর সমধিক প্রকাশ। প্রত্যেক নারীকে দেবীমূর্ত্তি জ্ঞানে শ্রদ্ধা করাই মহামায়ার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। এই জন্য দুর্গাপূজাতে কুমারীপূজার বিধি। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বীয় সহধর্মিণী শ্রী শ্রী সারদাদেবীকে জগজ্জননী জ্ঞানে ফুল, চন্দন, বস্ত্র ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করেছিলেন। শ্রী শ্রী চন্ডীতে নারায়ণী স্তুতি এইরূপ ঃ

''দেবী প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য
আধারভূতা জগতস্তমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃস্থিতাসি।''

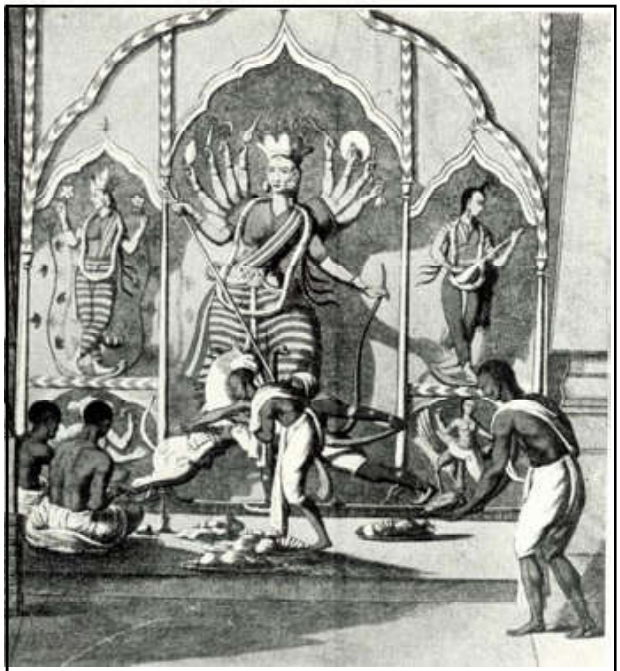

প্রাচীন কোলকাতার দুর্গোৎসব ঃ- শিল্পী বালথাজার সলভিনস্

অর্থাৎ ''হে, ভক্ত-দুঃখহারিণি দেবী, আপনি প্রসন্না হউন। হে নিখিল বিশ্বজননী, আপনি প্রসন্না হউন। হে বিশ্বেশ্বরি আপনি প্রসন্না হইয়া বিশ্বপালন করুন। হে দেবী, আপনি চরাচর জগতের অধিশ্বরী।''

মহাষ্টমী ও নবমী পূজার সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজা হয়। এই পূজা শাস্ত্রমতে ৪৮ মিনিটের মধ্যে সমাপ্ত করতে হয়। সন্ধিপূজাতে দেবী চামুন্ডার পূজা করতে হয়। নবমী পূজাতে হোম, বলিদান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দশমী তিথিতে পূজা সমাপন করে বলা হয় - ''ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরংস্থানং যত্র দেশে মহেশ্বর। সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।'' এই মন্ত্র পাঠ করে দেবীর ঘট বিসর্জন দেওয়া হয়। অতঃপর অপরাজিতা পূজা হয়। অপরাজিতার লতায় এ পূজা হয়ে থাকে।

কলিকাতায় অর্থাৎ ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের সময়ে নথীভূক্ত যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করতেন। শোভাবাজারের রাজবাটী বলে এই বাটী বিখ্যাত। এই সময় কলিকাতার যে সব বিত্তশালী লোকেরা দুর্গাপূজা করতেন তাঁরা হলেন - প্রাণকৃষ্ণ মিত্র, কেষ্টচাঁদ মিত্র, নারায়ণ মিত্র, রামহরি ঠাকুর, বারাণসী ঘোষ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, রাজা সুখময় রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি।

দুর্গাপূজা তখনকার দিনে ধনীদের বাড়ীতেই কেবল অনুষ্ঠিত হত। সর্বজনীন দুর্গাপূজার উৎপত্তি হয় হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে। বর্তমানে গৃহস্থবাটীর পূজা অতি অল্প হয়ে থাকে। তার পরিবর্তে কলিকাতা, হাওড়া ও বিভিন্ন জেলায় সর্বজনীন পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই পূজায় ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ সকলেরই প্রবেশ অবাধ।

রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড়মঠে ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ দুর্গাপূজা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং শ্রী শ্রী মা সারদাদেবীর অনুমতিক্রমে স্থির হল যে তাঁরই নামে সংকল্প হবে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল বলিদানও হবে কিন্তু মাতাঠাকুরাণী অনভিমত বলে পশু-বলিদান হয়নি। এই নিবন্ধে আর বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনা। দুর্গাপূজার ইতিবৃত্ত এইখানেই শেষ করছি। শেষ করার পূর্বে আজ এই পূণ্যতিথিতে মহামায়াকে আমার প্রণাম জানাই।

''সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে।।''

সুবক্তা ও সুলেখক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় ৭ই ডিসেম্বর ২০০১ সালে, অপ্রকাশিত এই লেখাটি তিনি লিখেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯৯১ সালে।

দুর্গোৎসবের মূলে অসাম্প্রদায়িকতা

দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী

শারদীয়া পূজায় কল্পারম্ভের দিন থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন চন্ডীপাঠ কর্তব্য। যদি কৃষ্ণানবমীতে কল্পারম্ভ হয় তাহলে শুক্লা নবমী পর্যন্তই চন্ডীপাঠ করতে হবে। এ থেকে বোঝা যায়, শাস্ত্রীয় বিধানে এবং ভক্তদের চিন্তনে চন্ডীর স্থান কোথায়, কত উচ্চে। মার্কন্ডেয় পুরাণের ৮১তম থেকে ৯৩তম এই ১৩টি অধ্যায়ই 'চন্ডী' নামে খ্যাত।

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এর প্রকৃতি খন্ডে (৫৭ অধ্যায়ে) শাক্ত দেবীদের নানা নাম আছে - তখন তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিতা হতেন, তখন তাঁদের ভিন্ন সত্তা ছিল। কিন্তু সেখানে চন্ডীর উল্লেখ নেই। সেইরকমভাবে বৈদিক সংহিতায়, রামায়ণে, মহাভারতে বা প্রাচীন পুরাণে চন্ডীদেবীর উল্লেখ দেখা যায় না। অন্যতম উপপুরাণ 'কালিকা পুরাণ'-এ চন্ডীর উল্লেখ আছে।

১৬শ শতকের মধ্যভাগে ব্যাধ কালকেতু-পূজিতা চন্ডীদেবী 'চন্ডীমঙ্গল'রচয়িতা কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর লেখনীর গুণে সুপ্রসিদ্ধা হয়ে ওঠেন, ধীরে ধীরে উচ্চতর সমাজে প্রবেশ লাভ করেন এবং আরও পরে দুর্গাদেবীর সঙ্গে একীভূতা হয়ে যান। কবি দেবখন্ডে হর-গৌরীর মানবীয় জীবনযাত্রা বর্ণনা করেছেন, আখেটিক খন্ডে ব্যাধের জীবনযাত্রাকে অরণ্য থেকে নগরে উন্নীত করে দেখিয়েছেন, আর বণিকখন্ডে ধনপতি-শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দেবখন্ডে তিনি মানবীয় আচার আচরণে দেবতাদের অভ্যস্ত দেখালেন, আখেটিক খন্ডে ব্যাধপুত্র কালকেতু নগরস্থাপন করছে দেখালেন, আর বণিকখন্ডে বণিকরা চন্ডীপূজা করে দুর্গতিমুক্ত হচ্ছে বিবৃত করলেন। একদা ব্যাধ কালকেতু যে কি না অচ্ছুৎ, তার পূজিতা দেবীর পূজা করছেন বণিক যিনি কালাপানি (সমুদ্র তথা বঙ্গোপসাগর) পার হয়ে নিজেই পতিত বলে হিন্দু সমাজে গণ্য হওয়ার যোগ্য -- কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই দেবীই ক্রমোত্তীর্ণ হয়ে মন্ডপে মন্ডপে আরাধিতা হচ্ছেন। চন্ডী নিজেই 'হাড়ির ঝি' নামে আখ্যাতা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অসৎ শূদ্রেরও নিচু পর্যায়ে হড্ডি বা হাড়ি সম্প্রদায়কে স্থান দেওয়া হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা অস্পৃশ্যরূপে গণ্য।

'চন্ড' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় যোগে 'চন্ডী' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। মানুষের মনের চন্ড ভাব প্রশমনের মধ্য দিয়েই দেবীর কৃপালাভ সম্ভব। অসুরদের মধ্যে অন্যতম প্রধান সেনাপতিদ্বয় চন্ড ও মুন্ডকে বধ করে কালিকা দেবী চামুন্ডা নামে খ্যাতা হলেন।

বাঙ্গলার সেন রাজত্বে অনার্য সম্প্রদায় এতটাই অস্পৃশ্য ছিলেন যে, উচ্চবর্ণের লোকেরা তাঁদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতেন না। 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রভাবে একটা প্রবল উত্তরণ ঘটে যায়। সপ্তগ্রামের বণিক সম্প্রদায় বল্লাল সেনের সময় থেকেই সমাজে পতিত ছিলেন। নিত্যানন্দের প্রভাবে তাঁরা বৈষ্ণবধর্ম নেন এবং শ্রী চৈতন্যের 'চন্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ' এই অভিধায় হিন্দু সমাজে উঠে আসেন। বণিকদের দেবীরূপেই একদিন চন্ডীদেবী উঠে এলেন। বাংলাদেশে যত জায়গায় চন্ডী দেবী প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন, সব জায়গাতেই বণিকরা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

চন্ডী কাহিনীতেই আছে, ক্ষত্রিয় রাজা সুরথ কোলা নামক শত্রু গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজধানীতে মন্ত্রী-অমাত্যদের শত্রুতায় টিকতে না পেরে একাকী ঘোড়ায় চেপে বনে চলে এলেন। সেখানে মেধা মুনির আশ্রমে কিছু সময় রইলেন। মনে কিন্তু তাঁর শান্তি নেই, সাম্প্রতিক ঘটনাবলির স্মরণে মন ব্যাকুল। সেই সময় সেখানে আর এক ব্যক্তি এলেন তাঁর নাম সমাধি বৈশ্য। তাঁরও স্ত্রী পুত্র অবাধ্য, ধনলোভে তারা তাঁকে ত্যাগ করেছে। অথচ তিনি স্ত্রী-পুত্রের মমতা ত্যাগ করতে পারছেন না। উভয়ের প্রায় একই সমস্যা। এ সবের নিরসনে তাঁরা মেধা মুনির পরামর্শ নিতে চাইলেন। মেধা ওঁদের সামনে অসুরদের দ্বারা দেবতাদের বিপর্যয় কাহিনী, সেই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য দেবতাগণ কর্তৃক নিজ নিজ তেজদ্বারা দেবীর সৃষ্টি কাহিনী, দেবতাদের নিজ নিজ অস্ত্রের দ্বারা দেবীকে সুসজ্জিতা করার কাহিনী এবং সেই সকল অস্ত্রের দ্বারা দেবী কর্তৃক অসুর নিধনান্তে দেবতাদের হৃত সম্পদ ফিরে পাবার কাহিনী বিবৃত করলেন। তখন সুরথরাজা ও সমাধি বৈশ্য নদীতীরে গিয়ে মাটি দিয়ে দেবীমূর্তি গড়ে পূজা করলেন। পরপর তিনবছর ওঁরা পূজা করায় ওঁদের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হল। ক্ষত্রিয় সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি দু'জনেই পুজোপকরণ সংগ্রহ করে পূজা-স্তবাদি দ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করেন। নিশ্চিতভাবেই কোনদিক থেকে কোন কিছুর বিশাল আয়োজন ছিল না, দেবীও তুষ্টা হয়েছিলেন।

প্রচলিত বিশ্বাসে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুর্গা দেবীর কন্যা, কিন্তু মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবীরই রূপ। মহালক্ষ্মী ও মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা ও চন্ডী অভিন্না, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধে তিনি অংশগ্রহণকারিণী।

মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর ধ্যানে উল্লিখিত অসুর হত্যার সংশ্লিষ্ট অংশ ঃ

মহালক্ষ্মীর ধ্যানে - 'শূলং পাশ সুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাং। সেবে সৈরিভ -মর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীংসরোজস্থিতাম্।।' (দেবী আঠারো হাতে অনেক কিছু ধরে আছেন, আলোচ্য অংশে) শূল, পাশ, সুদর্শন চক্র ধরে আছেন যে দেবী আমি সেই সৈরিভমর্দিনীর (মহিষাসুরমর্দিনীর) ধ্যান করি।

মহাসরস্বতীর ধ্যানে ঃ- 'গৌরীদেহ সমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহাপূর্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দিনীম্।।'

গৌরীর দেহ থেকে উদ্ভুতা ত্রিভুবনের আধাররূপিনী শুম্ভাদি অসুরনাশিনী অপূর্বা মহাসরস্বতীর আমি এখানে ধ্যান করি।

মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী দু'জনেই অসুরবধে যুক্তা। দেখা গেল বৈষ্ণবী দেবী গরুড়াসনা হয়ে শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, গদা, শৃঙ্গ নির্মিত ধনুও খড়্গ নিয়ে চন্ডীর কাছে এলেন এবং দেবী ও কৌমারী যখন নিজ নিজ অস্ত্র দিয়ে দৈত্যদের হত্যা করছেন তখন বৈষ্ণবীও চক্র দিয়ে দৈত্য বিনাশে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর চক্রের আঘাতে দৈত্যের দেহ থেকে যে রক্ত ঝরল তাতে হাজার হাজার মহাসুর জন্ম নিল, তাদেরও চক্র দিয়ে খন্ড খন্ড করতে লাগলেন। অর্থাৎ, বৈষ্ণবী শক্তিও যুদ্ধোদ্যমে সামিল।

স্বয়ং বিষ্ণুর তেজে দেবীর বাহু সৃষ্টি হয় যা দশপ্রহরণধারণের যোগ্য। বিষ্ণু নিজেই তাঁর কর্ণমলোদ্ভুত মধু ও কৈটভকে হত্যা করেছিলেন। তিনি বহু হিংস্র কাজের সহায়তাকারী বা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী। মধু দৈত্যকে হত্যা করেই তাঁর মধুসূদন নাম। সূদন অর্থে ঘাতক। এই নামটিই আবার শান্তিস্বস্ত্যয়নে জপ করা হয়।

বৃহদ্ধর্মপুরাণানুসারে ব্রহ্মা একদা দেবীকে নগ্ন বালিকারূপে দেখেন। দেবতারা শুনে দেবীর স্তব করতে থাকেন এবং দেবী প্রসন্না হয়ে দর্শন দেন। সে কারণে দুর্গাপূজার অন্যতম অঙ্গ কুমারী পূজা।

দেবীপুরাণে আছে পূজান্তে কুমারীকে তৃপ্তি করে খাওয়াতে হয়। 'অন্নদা কল্প আগম' গ্রন্থে বয়স অনুযায়ী কুমারীর নাম ঃ - সন্ধ্যা, সরস্বতী, ত্রিধামূর্তি, কালিকা, সুতপা, উমা, মালিনী, কুব্জিকা, কালসন্দর্ভা, অপরাজিতা, রুদ্রাণী, ভৈরবী, মহালক্ষ্মী, পীঠনায়িকা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অন্নদা।

প্রাণতোষণী তন্ত্রে কুমারী পূজার নির্দেশ ঃ

'কুমারী সর্বজাতিয়ৈব পূজ্যা।' -অর্থাৎ সকল জাতির কুমারীই পূজার যোগ্যা। তাদের মধ্যে প্রশস্তা হল - নটীকন্যা, কাপালিক কন্যা, রজককন্যা, নাপিতকন্যা, গোপালকন্যা, ব্রাহ্মণকন্যা, শূদ্রকন্যা, বৈদ্যকন্যা, বণিককন্যা, চন্ডালকন্যা, সুহৃদ্বর্গকন্যা।

'প্রাণতোষণী তন্ত্র' নামকরণের কারণ হল, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের নামের 'প্রাণ' শব্দ এবং 'তন্ত্রসার' গ্রন্থের রচয়িতা এবং কালীমূর্তির স্রষ্টা শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের নামের 'তোষণ' শব্দের সমাহারে 'প্রাণতোষণীতন্ত্র' নাম। এখানেও 'বিশ্বাস' এর সঙ্গে 'ভট্টাচার্য'-এর মেলবন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

কুমারী পূজা সম্বন্ধে ১৯.১০.১৯৯৯ তারিখের 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার সংবাদে জানা যায় যে, পূর্ব বৎসরে (অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে) চুঁচুড়ার সন্নিকটে ঝিঙে পাড়ায় নেপালাশ্রমের প্রধান ব্রহ্মচারী দুর্গা চৈতন্য এক মুসলিম মেয়েকে কুমারী রূপে পূজা করেছিলেন। ১৯৯৯-এ এক যৌনকর্মীর মেয়েকে ও এক খ্রিস্টান মেয়েকে কুমারী রূপে পূজা করলেন।

দুর্গাপূজায় দশমীতে ঘট বিসর্জনের পর সন্ধ্যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সধবা মহিলারা সিন্দুর উৎসব করেন।

প্রতিমা নিরঞ্জনের দায়িত্ব একসময় পালন করতেন শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে আদিবাসী শবর সম্প্রদায়, তাই তার নাম ছিল শবরোৎসব। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী, শব্দ উচ্চারণ ও ধূলিকাদা মাখামাখি ছিল সেই উৎসবের আবশ্যিক অঙ্গ ('ধূলিকর্দমবিক্ষেপৈঃ', 'ভগলিঙ্গ প্রগীতকৈ')।

সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে আনন্দ দেবার জন্যই এ উৎসব। আগে শহরের ধনীগৃহে সাহেব-মেমদের নিমন্ত্রণ করে আনা হত। সান্ধ্য ভোজ ছিল উল্লেখ করার মতো, বিখ্যাত বাঈজীরা নাচতে আসতেন।

গ্রামের পূজামন্ডপে রাত্রে যাত্রার আসরতো বসতই, কখনো গ্রামের দল, কখনো বাইরের দল। তারও আগে কবি গানের লড়াই, তরজার লড়াই হত, কথকতা, রামায়ণগান, পাঁচালী - কত কী? কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লাঠিখেলা, হাডুডু, লংজাম্প, হাইজাম্প, স্লো সাইকেল ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত।

সব রকমের মানুষের হাতে সম্প্রদায় নির্বিশেষে যাতে অর্থ আসে সেই ব্যবস্থা করার জন্যই এ উৎসব। পরিশেষে বিজয়া দশমী উপলক্ষে গুরুজনদের প্রণাম, বন্ধু জনদের আলিঙ্গন এবং বয়ঃ-কনিষ্ঠদের আশীর্বাদ প্রদান এ উৎসবের আবশ্যিক অঙ্গ। জাতীয়স্তরে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শুভেচ্ছা বিনিময় ঘটত যা এ উৎসবের অসাম্প্রদায়িকতা তুলে ধরত।

যামিনী রায়ের আঁকা গণেশজননী

সিংহবাহনা দেবী সিংহবাহিনী

শিবেন্দু মান্না

বাঙালির জীবনে উৎসবের শিরোমণি হল, শারদীয়া দুর্গাপূজা অর্থাৎ শারদোৎসব। জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই শারদোৎসবে কোনও-না-কোনও ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। ভারতীয় হিন্দু ধর্মে দেবদেবীর সংখ্যা অগণিত। দেব-দেবীদের রূপভেদও গণনাতীত। যাঁকে আমরা 'দেবী দুর্গা' বলছি, তিনি বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থে কত যে অজস্র নামে এবং রূপে বন্দিত, আখ্যাত হয়েছেন! খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকে দেবীমূর্তির বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। ফলে কত-নাম -না-জানা আদি মানুষের সমাজের দেবদেবী কল্পনা, আজকের দেবীমূর্তির মধ্যে স্থান পেয়ে গেছে এখন তার হদিশ পাওয়া ভারী কঠিন।

দুর্গাপূজায় আবশ্যিক অঙ্গ হল ''চন্ডীপাঠ''। 'মার্কন্ডেয় পুরাণ' গ্রন্থের ৮২তম থেকে ৯৩তম অধ্যায় পর্যন্ত অংশটি, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের জগতে 'শ্রী শ্রী চন্ডী' অথবা 'দেবী মাহাত্ম্য' নামে সুপরিচিত। 'মার্কন্ডেয় পুরাণ' গ্রন্থের আবার একটি বিশেষ অংশ হল ''দেবীবাহন সিংহের ধ্যান''। দেবীর সঙ্গে সিংহ-র ধ্যানে বলা হয়েছে, ''যাঁহার গ্রীবাতে বিষ্ণু, শিরে শিব, ললাটে পার্বতী, বক্ষে দুর্গা, করগ্রন্থিতে (কব্জি) কার্তিকেয়, কান দুটিতে অশ্বিনীকুমারগণ, এবং পাশে নাগ (সাপ) বিরাজ করছে, সেই দেবীবাহন সিংহ আমার অভীষ্ট বা কামনা পূরণ করুন।। যাঁর চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্র ও সূর্য, দন্তসমূহে অষ্ট বসু, জিহ্বা-তে বরুণ, হুঙ্কারে শ্রীদুর্গা চন্ডিকা, গন্ড দুটিতে যক্ষ ও যম, ওষ্ঠদ্বয়ে সন্ধ্যাদেবীদ্বয় এবং পৃষ্ঠে ইন্দ্র অবস্থিত, সেই দেবীবাহন সিংহ আমার সকল মনস্কামনা পূরণ করুন।।'' ..... ইত্যাদি। - এ সবই নৈষ্ঠিক পূজার অঙ্গ এবং ঋষির অনুধ্যান।

এখন প্রাচীন ইতিহাসের দৃষ্টিতে যদি অনুসন্ধান করা যায়, - তাহলে দেখা যাবে যে, মার্কন্ডেয় পুরাণ গ্রন্থ রচিত - অথবা সংকলিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় ২য়-৩য় শতক থেকে ৪র্থ-৫ম শতক মধ্যে। অথচ প্রত্নতত্ত্ব এবং মূর্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আশ্রয় নিলে দেখা যাবে যে কোনও পরিজন বা আত্মজন ছাড়াই সিংহবাহনা মহিষমর্দিনী মূর্তির নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব (আনুমানিক) প্রথম শতক থেকে! অর্থাৎ মার্কন্ডেয় পুরাণ রচনার তিন-চারশ বছর আগেই সিংহবাহনা দেবীর মূর্তির প্রচলন ঘটেছিল। - এটা কোনও আকস্মিক সংঘটন নয়। পরবর্তীকালের ভারতবর্ষে, শক-পহ্লব-কুষাণ এবং গুপ্তযুগে (অর্থাৎ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক-ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়সীমায়) মহিষমর্দিনী - মহিষাসুরমর্দিনী - সিংহবাহিনী মূর্তির প্রচলনের হদিশ ভালো রকম পাওয়া যাচ্ছে; এই সকল দেবী মূর্তির মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য বেশ প্রকট। প্রথমত, দেবীর পাশে সিংহের অবস্থান। দ্বিতীয়ত, দেবী একটি মহিষকে অথবা মহিষ-অসুরকে বধ করছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে মার্কন্ডেয় পুরাণ গ্রন্থে রচিত বা সংকলিত হওয়ার পূর্বে, কিংবা সমকালে দেবী মূর্তির পাশে (একসাথে) সিংহের সঙ্গে মহাদেবী দুর্গার যোগাযোগ, ভারতের মাটিতে, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক অথবা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের পূর্বে গড়ে না উঠলেও, সিংহের সঙ্গে বহির্ভারতীয় বা অভারতীয় একাধিক দেবীর ঘনিষ্ঠ যোগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; এযাবৎ প্রাপ্ত অভারতীয় দেবীমূর্তির সূত্রে আমরা জেনেছি যে সুমেরের 'নিনলিন' গ্রীসের 'রিয়া', ব্যবিলনের 'ননা', পারস্যের 'অনাহিত', মধ্য এশিয়ার 'সিবিলি' প্রমুখ দেবীদের সাথে সিংহের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। এই সকল দেবীর পূজাপাঠ ওই সকল দেশে প্রচলিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের আগেই ইরান সহ পশ্চিম এশিয়ায় দেবীর বাহন হিসাবে সিংহ বেশ পরিচিত ছিল, একথা বলা চলে। এছাড়া, দেবাসুরের যুদ্ধে দেবীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং অসুরনিধনের বিষয়টিও ভালোরকম প্রচলিত ছিল। এই তথ্যগুলিকে প্রাচীন ইতিহাসের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে বলা চলে যে, ইরান সহ মধ্যপ্রাচ্য এবং ভূমধ্য সাগরীয় এলাকায় প্রাচীনকালে যে সকল উন্নত ও সভ্য দেশ ছিল, তাদের সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগসূত্রও একদা গড়ে উঠেছিল, চিন্তা, ভাব ও শিল্পকলার আদান-প্রদানও ঘটেছিল, এর ভিত্তিতে যে একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল, আজও তার প্রভাব রয়ে গেছে। প্রত্নতত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব, প্রাচীন শিল্পকলার ইতিহাস অনুসরণ করলে এমন বিস্ময়কর বহু ঘটনার সাক্ষ্য মেলে। সিংহবাহন দেবী ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব ভাবনাজাত নয় বলেই ধারণা জন্মায়।

দুর্গার মূর্তি অগণন, তার মধ্যে অন্যতম হল সিংহবাহিনী মূর্তি। সিংহবাহন দেবীর কথা ''শ্রীশ্রীচন্ডী''-র মধ্যে পাই; গিরিরাজ হিমালয় নানাবিধ রত্নরাজির সাথে সাথে বাহন হিসাবে দেবীকে উপহার দিয়েছিলেন সিংহ, ('হিমবান বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ'); এর সাথে দেখুন, 'দেবীবাহন সিংহের ধ্যান'। সব মিলিয়ে দেবীর বাহন সিংহ-র উপস্থিতি বেশ গাম্ভীর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্যক্ষেত্রে সিংহ হল শৌর্য, বীর্য, এবং পরাক্রমের প্রতীক, যা মহা দেবী বনাম মহিষাসুরের যুদ্ধের সাথে মানানসই। অপরপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বিশাল বপু মহিষ কেন 'অসুর' প্রতীক হল, তার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দেখা দরকার রয়েছে, যা আদিম আদিবাসীদের জীবন ধারার সাথে যুক্ত, ধর্মাচরণের সাথে যুক্ত। লক্ষণীয় হল, পুত্রকন্যাগণ ব্যতিরেকে দেবী সিংহবাহিনীর প্রাচীন মূর্তি এবং নিত্য পূজাপাঠ হাওড়া জেলায় রয়েছে। হাওড়া জেলা

রূপলাল মল্লিকের বাড়ির সিংহবাহিনী

মধ্যে প্রাচীনতম সিংহবাহিনী মূর্তি রয়েছে মৌজা - নিজবালিয়া, থানা - জগৎবল্লভপুরে; হাওড়া সদর-শহর থেকে হাওড়া-আমতা ভায়া ডোমজুড়-বড়গাছিয়া-পাঁতিহাল পাকা রাস্তা ধরে মিনিবাস যোগে ওই গ্রামে পৌঁছানো যায়। এছাড়া সাঁকরাইল স্টেশনে নেমে ট্রেকার যোগেও যাওয়া চলে। নিজবালিয়ার সিংহবাহিনী মূর্তি নিমকাঠের তৈরি, প্রায় চারশ' বছরের পুরাতন। প্রাচীন বঙ্গীয় শিল্পকলার (দারু-ভাস্কর্যের) অনুপম নিদর্শন। আলোচ্য সিংহবাহিনীর প্রাচীনত্ব প্রমাণের সহায়ক হল, - ১. কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-র (খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতক) কাব্যোক্তি ঃ ''বালিয়ায় বন্দিলাঙ সিংহবাহিনী / অনাথ দেখিয়া দয়া কর্যাছে আপুনি।'' (চন্ডীমঙ্গল ঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য একাডেমী, ১৯৭৫); ২. কবিশেখর বলরাম (খ্রিঃ ১৭শ শতক), 'কালিকা মঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন ''বালিয়ায় বন্দিলাম জয় সিংহবাহিনী'' -

অষ্টবাহু দেবী সিংহবাহিনীর বামদিকের তিনটি হাতে অসি, বাণ, পাশ এবং ডানদিকের তিনটি হাতে ঢাল, ধনুর্বাণ, শঙ্খ; অপরাপর বাম ও ডান হাতে বর ও অভয়মুদ্রা, দেবীর পদতলে বাহন সিংহ। অত্যন্ত শান্তরসাস্পদ মাতৃমূর্তি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

যেহেতু এই গ্রামে দেবীর নিত্যপূজা হয়, তাই শারদীয় দুর্গোৎসবের কালে মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমীতে বিশেষ পূজা; সীতানবমী তিথিতে বিশেষ বাৎসরিক উৎসব ও অন্নকূট হয়। বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন আসেন। পাকা বৃহদাকার আটচালা মন্দির, নাট মন্দির প্রভৃতি জেলা মধ্যে দর্শনীয় স্থান।

বাগনান থানাধীন হরিনারায়ণপুর মৌজায় (নিজ হরিনারায়ণপুর) রয়েছে দেবী সিংহবাহিনীর মূর্তি ও মন্দির। লোকশ্রুতি আছে যে, দামোদর এবং রূপনারায়ণ নদের সংযোগকারী চেটুয়া খালের একাংশের নাম দুর্গাদহ; এখান থেকে বহুকাল পূর্বে সোনার তৈরি একটি দুর্গা-সিংহবাহিনী মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, সেই সোনার দুর্গা-সিংহবাহিনী প্রতিমা চুরি যাওয়ার পর, বর্তমান অষ্টধাতুর দুর্গা-সিংহবাহিনী মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিক, গণেশ প্রমুখ দেবীর পুত্রকন্যা অনুপস্থিত। দশভূজা সিংহবাহিনী মূর্তি, মহিষাসুরের দেহ অর্ধেক মহিষ, অর্ধেক অসুর মূর্তি। দেবীর পিছনে কারুকাজযুক্ত চালচিত্র। এখানেও শাস্ত্র বিহিত শারদীয়া দুর্গোৎসব হয়; রাস ও দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা; দোলের দিন মেলায় অজস্র লোক আসে। আলোচ্য সিংহবাহিনী দেবীর পূজা প্রায় তিনশ' বছরের প্রাচীন বলে গ্রামবৃদ্ধদের অভিমত।

পাঁচলা থানাধীন দেউলপুর গ্রামেও একটি কাঠের তৈরি সিংহবাহিনী মূর্তি দীর্ঘদিন ধরে পূজিত হচ্ছে। এছাড়া, আরও দু'একটি গ্রামে সিংহবাহিনীর মূর্তি ও মন্দির আছে বলে জানা গেছে।

খ্রিঃ ষোড়শ শতকের প্রখ্যাত কবি, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, দেবী চন্ডী তথা মহিষমর্দিনী তথা সিংহবাহিনী মূর্তির যে অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, তার কিয়দংশ হল ঃ-

''মহিষমর্দিনী রূপ ধরেন চন্ডিকা।
অষ্টদিকে শোভা করে অষ্টনায়িকা।।
সিংহপৃষ্ঠে আরোপিলা দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পিঠে বাম পদ আরোপণ।।
বাম করে মহিষাসুরের ধরে চুল।
সব্য করে তার বুকে আরোপে ত্রিশূল।।(সব্য=ডান)
পাশাঙ্কুশ খট্টাঙ্গ খেটক শরাসন।
বাম পাঁচ করে শোভে পাঁচ প্রহরণ।।
অসি চক্র শোল আর বিনাশিতে শর।
পাঁচ অস্ত্রে শোভিত দক্ষিণ পাঁচ কর।।''..... ইত্যাদি

কবিকঙ্কণ মুকুন্দর বর্ণনা মধ্যে মহাদেবীর বামে কার্তিক ও সরস্বতী এবং ডাহিনে গণেশ ও লক্ষ্মী এবং মাথার উপর বৃষ-আরোহণে শিব-এর মূর্তি বর্ণনাও পাওয়া যায়, অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালে মহাদেবী দুর্গা-সিংহবাহিনীর যে মূর্তি আমরা দেখতে পাই।

হাওড়া জেলায়, আমতার 'মেলাই চন্ডী'র নাম কে না জানে? বাংলা সন ১২৬২ সালে (১৮৫৫-৫৬খ্রিঃ সন) কবি রামচরণ দত্ত লিখিত 'মেলাই চন্ডিকা কথা' নামীয় একটি পুঁথি, বন্ধুবর পুঁথি বিশারদ ডঃ ত্রিপুরা বসুর সংগ্রহে আছে। পুঁথিতে প্রদত্ত কাহিনীটি আলাদা ধরণের, লোকধর্মীযুক্ত ব্রতকথা। আলোচ্য পুঁথিতে কবি রামচন্দ্র দত্ত বর্ণিত দেবীমূর্তি হল -

''দশভূজা হৈলা চন্ডী সিংহবাহিনী।
বদন সংপুণ্য চন্দ্র জিনিয়া উজ্জ্বল।। (সংপুণ্য = সম্পূর্ণ)
অষ্ট করে অষ্ট অস্ত্র ধরে সুশোভন।
দুই করে দুই মুয়া ভক্তের কারণ।।'' (মুয়া=মোয়া)

বরাভয়ের তুল্য দু'টি মোয়া দেবী দিচ্ছেন তাঁর ভক্তকে পেট পুরে খাওয়ার জন্য! - দেবীর এমন ঘরোয়া চিত্রখানি একান্তভাবে আমাদের ঘরের মায়েদের কথাই তো মনে পড়িয়ে দেয়। এই হলো আমাদের চিরকালের বঙ্গভূমি, চিরকালীন অপরূপা মাতৃমূর্তি।

নামে কি আসে যায়

অলোককুমার মুখোপাধ্যায়

গোলাবারুদের দোকানে যেমন প্রিয়জনকে উপহার দেবার মতো বুক বা বোকে পাওয়া যায় না, রাজনীতিকের কাছে তেমন দেশবাসীকে উপহার দেবার মতো নাম খোঁজা চলে না। অথচ শেষপর্যন্ত তাই হল। ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরাও তাঁদের প্রিয় আবার জনগণেরও গ্রহণযোগ্য শঙ্খ ঘোষ, সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমুখের যুক্তিগ্রাহ্য মতামত না নিয়েই বলে দিলেন, এ রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ (ইং)।

প্রথম প্রশ্ন, নাম পাল্টাবার যুক্তিটা কি? 'ডব্লু' মার্কা ওয়েস্টবেঙ্গল সাত-আট পা এগিয়ে এসে 'পি'-মার্কা পশ্চিমবঙ্গ হলে কতোটা লাভ হবে? আপাতদৃষ্টিতে তো মনে হয়, এটা যেন বাচ্চা ছেলের অভিমান - আমার নাম আগে নয় কেন? আমি কি আমার ভাইবোন বা বন্ধুবান্ধবদের চেয়ে খারাপ? ছোট হয়ে যাবার ভয়। আমার ভাগের উপহারটা যদি খারাপ হয় বা আমাকে দেবার আগেই যদি খাবারের প্যাকেট ফুরিয়ে যায়, এই শিশুসুলভ আকাঙ্খা। এখানে সে আশঙ্কা থাকার কথা নয়। সংবিধান মতে সব রাজ্যই সমান ও সবাই তার নির্দ্ধারিত প্রাপ্য অংশ পাবেই। আগে এলে সোনা পাবে, শেষে এলে বাঘে খাবে - এমন ভাবনা নিতান্ত ছেলেমানুষি। বুড়ো মানুষের ছেলেমানুষি, যাকে বলে দাদুর ললিপপ খাবার ইচ্ছা।

দ্বিতীয়তঃ আগে যাবার বা আগে পাবার জন্য মারামারি ঠেলাঠেলি কিসের জন্য? অপরকে আগে সুযোগ দিলে তো আমারই গৌরব হবে, এটাই তো প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি। কেবল রাজ্যের নামটা তালিকায় কিছুটা তুলে আনার চেষ্টা না প্রশংসার, না গৌরবের, বরং হাসির ব্যাপার হল। এবার হয়ত উত্তরপ্রদেশ বা উত্তরাখন্ড প্রভৃতি রাজ্যগুলো নাম পাল্টাবার চেষ্টা করবে আগে আসার জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ নামটা আজও সেই দেশভাগের অভিশাপ ও দুঃস্বপ্নের কথাটা স্মরণ করে দেবে। বরং দেশভাগের আগে এই প্রদেশের যে নাম ছিল সেটাই ভাবা যেতে পারত। বাংলা বা বেঙ্গল হলে এগিয়ে আসার ইচ্ছাটাও মিটত। বেশি করে, সেই সঙ্গে দুঃস্বপ্নের ইতিহাসও ঘুচত। পাঞ্জাবকেও দু-ভাগ করা হয়েছিল কিন্তু ভারতের অংশটি পূর্ব পাঞ্জাব নামে চিহ্নিত হয়নি, পাঞ্জাবই থেকে গেছে। বাংলাদেশীরা ইষ্টবেঙ্গল বা ইষ্ট পাকিস্তানকে ভুলতে 'ইষ্ট' বা 'পূর্ব' কথাটি রখেনি, কেবল বাংলাদেশ।

ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে 'বঙ্গ' নামটাও ভালো ছিল। কারণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ নাম বহু প্রাচীন। ঋষি দীর্ঘতমার পুত্রদের একজন 'বঙ্গ' আর তাঁরই নামে বঙ্গ। অবশ্য এখানেও সমস্যা সৃষ্টি করা যেতে পারে। অতি অসাম্প্রদায়িকরা বলতে পারেন হিন্দুঋষির বাচ্চার নামে রাজ্যের নাম হবে কেন?

তবে নামটা 'বঙ্গ' হলেই ভালো হত, তার উত্তর ও দক্ষিণ বলা যেতে পারত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গ কথাটা কেমন বেমানান।

এরপর আছে রাজ্যের খরচপাতির কথা। একে তো ভাঁড়ে মা ভবানী; ধার করে, সাহায্য চেয়ে, এমনকি জোর খাটিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে দেশের রোজের খরচ মেটাতে। এরপর যোগ হবে নতুন খরচ, নাম পাল্টাবার খরচ। কেবল 'ক্যালকাটা' কেটে 'কলকাতা' করতে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ক্যালকাটা পুলিশ বদলে 'ক।প' লিখতেই বিস্তর খরচ হয়েছিল। এবারে ওয়েষ্টবেঙ্গলকে ওয়েস্টপেপার বক্সে ফেলে পশ্চিমবঙ্গ লিখতে খরচ করতে হবে অনেক, কেবল পশ্চিমবঙ্গকে নামের তালিকায় এগিয়ে আনতে।

আরও একটু বলার আছে। 'পশ্চিমবঙ্গ' শব্দের ইংরেজি বানান ঠিক কি হবে? PASCHIM-এই বানানটাই প্রথমে মনে আসে কিন্তু বানানেরও কিছু ব্যাকরণ বা নিয়ম চালু আছে। আনন্দ পদ্ধতিতে যা ইচ্ছা লেখা যায় কিন্তু তাতে বিদগ্ধ ব্যাকরণবিদদের সমর্থন মিলবে কি? ব্যাকরণটা হল 'শ' শব্দের জন্য Sh আর বাকি স-য এর জন্য কেবল 'S' চলে - শিব, শ্যামল বানান লিখতে যদি Sh ব্যবহারের বিধান হয় তবে 'শ্চ' কি ভাবে হবে? না মানার শিক্ষা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ইতোমধ্যে রপ্ত করেছে। অতএব ঠিক বানান লিখতেই বা নিয়ম মানব কেন?

শেষ কথা। এবার ভারত কি আন্তর্জাতিক তালিকায় এগিয়ে আসতে তার ইন্ডিয়া নামটা 'ভারত' করার চেষ্টা চালাবে? পারলে যথেষ্ট লাভ হবে - এক লাফে হয়ত এক বা দেড়শ পা পথ এগিয়ে আসবে। তবে সম্ভবতঃ সেটা হবে না কারণ ইংরেজ হটিয়েও ইংরেজপ্রীতি আমাদের কমেনি বরং বেড়েছে। যতো দিন যাচ্ছে ভারতের মানুষের ইংরেজি সভ্যতার (?) প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা যাচ্ছে বেড়ে। সাদা রং পেতে আর ইংরেজি বোল - চাল রপ্ত করতে আমরা মরিয়া। ইংরেজের চেয়ে ইংরেজীভাষী ভারতীয়রা ইংরেজি না জানাদের বেশি ঘৃণা করে। তাই ইন্ডিয়া সুবিধা পেলেও ভারত হবে না।

কথকতার খোঁজে, পুথির খোঁজে, বেতড়ে

শ্যামল বেরা

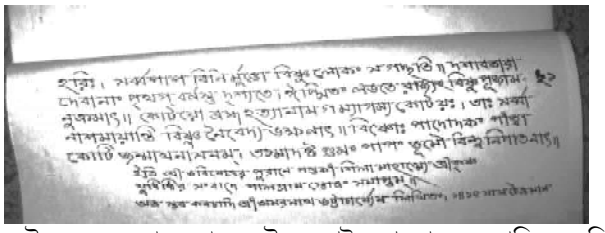

বেতড়। হাওড়া জেলার পুরানো জনপদ। বিপ্রদাস পিপ্‌লাই-এর মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগরের সমুদ্রযাত্রাপথের বিবরণে 'বেতড়ে'র উল্লেখ রয়েছে। বেতড় পুরানো বাণিজ্য বন্দর। এখন সে বন্দরের চিহ্ন নেই, বেতড় এখন নগর। এই বেতড়েই প্রায় দশ পুরুষের বসবাস অমরনাথ ভট্টাচার্যদের।

অমরনাথবাবুর সংবাদ-টা দিয়েছিলেন পল্টুদা (ভট্টাচার্য)। পল্টু-দা ফোনে জানালেন - অমরনাথবাবুর বাড়িতে পুথি আছে, রামরাজার পূজক পাঁচপুরুষ ধরে, কথকতা করার পারিবারিক ঐতিহ্য রয়েছে। ফোন নম্বরটাও তিনি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই যোগাযোগ করি।

রবিবার সকাল। ২১শে শ্রাবণ ১৪১৮। সকাল থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। বেরিয়ে তো পড়লাম। আন্দুল থেকে রামরাজাতলা স্টেশন - গন্তব্য সাঁতরাগাছি মোড় থেকে বেতড়। রাস্তায় হাঁটুখানেক জল। অগত্যা রিক্সায় বেতড়। পারিবারিক অশৌচ-এর কারণে পূজা-পাঠ নিয়ে অমরবাবুর ব্যস্ততা নেই। সকাল তখন ৯টা।

পাখোয়াজ, তানপুরা, তবলা - নানা বাদ্যযন্ত্রে ভরা ঘরে গালিচায় বসতে বললেন অমরবাবু। পাশেই ঠাকুরঘর থেকে আসছে ধূপের স্নিগ্ধ সুবাস। মধুর আবেশে সম্মুখে বসলেন তিনি। আগমনের কারণ আগেই ফোনে জানিয়েছিলাম। তাই, কথার শুরুতে রের্কডিং করার কথা তুলতেই - তিনি বললেন - আগে তো শুনুন, পরে একদিন রের্কডিং করবেন। বহু অজানা কথা তিনি শোনালেন, বহু পুথি দেখালেন। ধ্রুপদী গান এবং চন্ডীপাঠে তাঁর যে সব সিডি বেরিয়েছে সে সবও দেখা হল। তিনি বললেন -

'পাঁচ পুরুষ ধরে রামরাজাতলার 'রামঠাকুরের' সেবাইত তাঁরা। পাঁচ পুরুষের প্রথমজন হলেন হলধর ন্যায়রত্ন। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক। হলধরের ছেলে নন্দলাল ভট্টাচার্য। নন্দলালের ছ'য় ছেলে। তাঁর এক ছেলে সন্তোষ ভট্টাচার্য। নন্দলাল পুথি লিখতেন। ছেলে সন্তোষও পুথি লিখতেন।

সন্তোষের ছেলে ঘনশ্যাম, হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং আমার সেজো জেঠামহাশয় ভবনাথ, বাবা ভৈরব সবাই পুথি লিখেছেন, কথকতা করেছেন। ভবনাথ রেডিওতে কথকতা করেছেন। ন-জেঠামহাশয় বৈজয়ন্ত নাথ ভালো গান করতেন।

দুর্লভ ভট্টাচার্য থাকতেন শিবনারায়ণ দাস লেন-এ। আসলে, নন্দলাল সেখানে মাতুল সম্পত্তি পেয়ে পরে চলে যান। দুর্লভ ভট্টাচার্য চমৎকার পাখোয়াজ বাজাতেন। গানও রচনা করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং দুর্লভ-এর পাখোয়াজের গুরু ছিলেন মুরারীগুপ্ত।

পারিবারিক এই ঐতিহ্য - পুথি পাঠ, পুথি লেখা, কথকতা ও গান পরিবেশন - সবই ছোটবেলা থেকে দেখেছি, শুনেছি এবং করেওছি - আর পূজাআর্চা তো ছিলই। রামতলার নাটমন্দিরে রামনবমীর শুরুতে রাম পূজার শুরু এবং শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার বিসর্জন। প্রতিদিনই রামকথা 'কইতে' হতো। এখন এত ভীড় হয় যে সে-সব আর করা যায় না।

ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য ছিলেন পুথি লেখক এবং সংগ্রাহক। পুথি ছাড়া অন্যান্য সংগ্রহও ছিল। তাঁর সংগ্রহের বেশ কিছু পুথি তিনি আমায় দিয়েছেন। পুথিগুলো দেখুন।'

১। ৬৬ পৃষ্ঠার একটি পুথি - লম্বা ১৮ ইঞ্চি, চওড়া ২.৫ ইঞ্চি। পুষ্পিকায় লেখা রয়েছে - 'ইতি বাল্মীকিকৃতং রামায়ণং সমাপ্তং।' শ্রী সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য পুস্তক মিদং ১২৯৮ চৈত্র।

তুলট কাগজে লেখা পুথিটির বয়স ১২০ বছর।

২। তালপাতার চন্ডীপাঠের পুথি

পুথিটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩। লম্বা ১৩ ইঞ্চি, চওড়া ২ ইঞ্চি। পুষ্পিকায় লেখা ঃ শ্রী নন্দলাল দেবশর্ম্মনং স্বাক্ষয়ম পুস্তকঞ্চ সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২০শে ভাদ্র।

১২৪ বছরের পুরাতন পুথি।

৩। বিবাহ পদ্ধতি ও দেব প্রতিষ্ঠা পদ্ধতির পুথি

৪। গোপাল স্তব এর পুথি

পুষ্পিকায় লেখা - ইতি সন্যাসীন্দ্র শ্রী বিল্বমঙ্গলদ্ধৃত শ্রী গোপাল স্তব সমাপ্ত।

পুথি দেখতে দেখতে অমরবাবু বললেন - বেশ কিছু পুথি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৮ সালের বন্যায় বেতড়ের বহু পুথি নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু পুথিতে উই লেগে নষ্ট হয়েছে। সিমলায় ঠাকুরঘরে বহু পুথি ছিলো - সে ঘরে আগুন লেগে পুথি নষ্ট হয়ে গেছে। এই দেখুন - এই পুথিটার কিছু অংশ আগুনে পুড়ে গেছে - তাও আমি রেখে দিয়েছি। (আগুনে খানিক পুড়ে যাওয়া পুথি দেখালেন)।

বললেন - আমার এখানে মূলত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পূজা-পাঠের পুথিই রয়েছে। মঙ্গলকাব্যের পুথি নেই। কিছু ন্যায়ের পুথিও আছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বিশেষ করে বৃষোৎসর্গ-এ মহাভারতের 'বিরাট পর্ব' পাঠ হতো। হলধর ন্যায়রত্ন থেকে যে পাঠ শুরু হয়েছে, তা আমিও করেছি, কিন্তু অন্যান্য মাধ্যমে এত ব্যস্ত যে 'কথকতা

কইবার' ফুরসুৎ নেই।

কথকতার রামায়ণ ঃ

প্রথ ম পাতার বিবরণ - 'শ্রীরামচন্দ্রতত্ত্বে।৵ কৃত্বাপাপ সহস্রানি মহাপাতকথাথপি। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রামরামেতি কীর্ত্তনং।। প্রথমতঃ শ্রীরামনামঃ প্রচার বৃত্তান্ত মাহ ।৵ কৈলাস শিখরে র... সপ্রিয়শ্চন্দ্র শেখরঃ। আনন্দ সংপ্রবে মগ্নস্তত্ব ব্যাখ্যা পরঃ সদা। অথ একদা কৈলাশাদ্রি শিখরেচন্দ্র। শ্রীচন্দ্রশেখর প্রিয়াসহ কল্পতরুমূলে মণিভূষিত রত্নবেদী মধ্যে, নিজানন্দোদ্দীপনে, ভক্তিমুক্তি কলাদ্গীরণে মহানন্দে মগ্ন। বিবিধ প্রস্তাবালায়িত চিত্ত। ইতিমধ্যে অকস্মাত রোদন ধ্বনি। ভগবতি উ-কাঁদে কেঃ দিক্ অবলোকন। দেখেন প্রভূর পঞ্চদশ নয়নে প্রেমধারা। ঠাকুর এ কি আপনি কাঁদেন যে।'

প্রথম পৃষ্ঠার চার সারিতে আলোচ্য অংশটি লেখা রয়েছে অপেক্ষাকৃত বড় হরফে। চার সারির উপরে এবং নীচে ফাঁকা জায়গায় (সম্ভবত পরের সংযোজন) উপরে দু'সারি এবং নীচে দু'সারিতে লেখা রয়েছে - উপরের সারি 'আমি আপনাদের নিকট রামলীলা বর্ণনা করিব। এই রামলীলা বর্ণনে কিংবা শ্রবণে মানবের কি শ্রেয় হয়, তাহাই শুনিতে হইবে, কেননা এই জগতে জীব যা কিছু কর্ম্ম করুক না কেন সকলেরই সেই কর্ম্মফলে তীব্র আকাঙ্খা থাকে ঃ অতএব এই রামায়ণ শ্রবণ বা বর্ণনা করিলে মানব সমগ্র সহস্র মহাপাতক রূপ পাপের হাত হইতে ত্রাণ পায়। এবং জীব যদি প্রেম ভরে রাম নাম মুখে উচ্চারণ করে তবে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে স্বর্গ'

নীচের সারি - 'ধামে গমন করে। অতএব এই রামায়ণ সকলেরই পাঠ করা এবং শ্রবণ করা বিধেয়, প্রথমতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ও প্রয়োজন না জানিলে কোন সুধী ব্যক্তি সে গ্রন্থে মনোনিবেশ করেন না। সেই জন্যই আজ প্রথমতঃ আপনাদের নিকট রামায়ণের প্রতিপাদ্য স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র এবং তাঁহারই মহিমাময় কীর্ত্তি আর প্রয়োজন ভবসাগর পার হওয়া তাহা 'রামের লীলা' শুনিলেই হইবে। অতএব গ্রন্থারম্ভ করি।'

পুথির প্রথম পাতার পর গোলাপী কাগজ (চিরকুট)-এ লেখা - (সম্ভবত কথকঠাকুরের নিজস্ব সংযোজন) -

'জয় হে রঘুনন্দন জীবজগতে; জয় কারণ বৎস সমূল হতে। মিহিরান্বয় দীপ বিধিহি বিভো মিহিরাম্মদ গেহ গতির্ণ যথা।। দশকণ্ঠ রিপো দল পূর্ব্বরথা শিধরাজ জানে জলদেক পতে। বিজয়া নিল মঙ্গ মুদং মুখহা হন্তক সে মতি রন্তু ও বাচিস্য যুগে। জনকাত্মজয়া দুহিত সয্য তনু। প্রবিভাগ বিশাল সুনীল রুতে। শর দর্পিত নির্ম্মল শোভ কলা, পরিপূর্ণ কলানিধি বক্ত্রশুতে।। পরমানতনূজ মনোমলিন, প্রকটী করনৈক বিভাকর হে। মনুবংশ ধুরন্ধর বারয় সে ভববন্দিত পদ গতিংনু তবে।'

সাদা কাগজে লেখা দ্বিতীয় চিরকুট -

'রামায়ণে প্রথমেই বাল্মিকীর জন্ম এর কারণ কি - কেন না যাঁহার রচিত গ্রন্থ পাঠ করতে হয় - তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত এবং তাঁহার চরিত্র শুনতে বোধ হয় সকলেরই ইহা হয়। বিশেষ এই বাল্মিকীর জন্ম বৃত্তান্ত অতীব মধুময়। কারণ ইনি লীলাময় ভগবানের লীলা বর্ণনা কর্ল্লেন এবং সমস্ত জীবের মুক্তির উপায় করে দিলেন তিনি বাল্যে কিরূপ ছিলেন - আর হতাশ বৃদ্ধ, রোগী জীব সকলে বাল্মিকী জন্ম কথা শ্রবণ করো এবং দেখ লীলাময় করুণাময়, ভগবান সর্ব্বদা তোমাদের করুণার জন্য ব্যস্ত কিন্তু আমরা এতই পাতকী যে দিনান্তে ভগবানের নাম একবার স্মরণ করি না।'

সমগ্র পুথির মধ্যে অজস্র চিরকুট। আসলে, কথকতার মধ্যে রয়েছে - শ্লোক, গান, কথার বিস্তার - সব কিছুই রয়েছে পুথির মধ্যে মধ্যে। মহাভারতের একটি পুথির সূচিপত্র এইরকম -

আদি-১, সভা-২, বন-৩, বিরাট-৪, উত্যোগ-৫, ভীষ্ম-৬, দ্রোণ-৭, কর্ণ-৮, শল্য-৯, সৌপ্তিক-১০, স্ত্রী পর্বের অন্তর্গত শান্তি, রাজধর্ম্ম, আপধর্ম্ম-১১, মোক্ষধর্ম্ম-১২, অনুশাসন-১৩, অশ্বমেধ-১৪, আশ্রমিক-১৫, মোষল-১৬, মহাপ্রস্থানিক-১৭, স্বর্গারোহণ-১৮।

সব থেকে পুরাতন পুথি ১১১২ সালের, অর্থাৎ ৩০৬ বছর পূর্বের। বিভিন্ন ভাস ও দায়ের পুথি। পুথির শেষ পাতায় পরবর্তী কালের লেখা 'এই পুঁথি বহু পুরাতন অনুগ্রহ করিয়া কেহ ফেলিও না।।'-শ্রী ঘন্টু। এই 'ঘন্টু' হলেন ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য।।

বহু পুথির এক ঝলক মাত্র দেখা - অসম্পূর্ণ দেখা বৈকি। আরও বহুবার আসতে হবে এবং অমরনাথবাবু আসতেও বললেন। হাতে লেখা পুথির পাশাপাশি ছাপা পুথি রয়েছে, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রয়েছে। হরনাথ ন্যায়রত্ন যে কাজের শুরু করেছিলেন, তা অমরনাথবাবু আজও লালন করে চলেছেন। তিনিও পুথির অনুলেখন করছেন - ১৪১৫ সালের চৈত্রমাসে তাঁর অনুলিখিত একটি পুথির পুষ্পিকা এই রকম - 'ইতি শ্রীভবিষোত্তর পুরাণে গন্ডকী শিলা মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সংবাদে শালগ্রাম স্তোত্রং সমাপ্তম।। অত্র স্তবকবচাদি শ্রী অমরনাথ ভট্টাচার্য্যেন লিখিতং। ১৪১৫ সাল চৈত্র মাস।'

পুথি লেখা, পুথি পড়ার পাশাপাশি তাঁর রয়েছে সংগীত সাধনা। 'সম্পূর্ণ শ্রী শ্রী চন্ডী' 'গঙ্গা স্তবমন্ত্র' পাঠ করেছেন পন্ডিত অমরনাথ ভট্টাচার্য। এসবের সিডির বেশ চাহিদা রয়েছে। এছাড়া, তিনি গান রচনা করেন, সুর দেন এবং গান পরিবেশনও করেন। এসব কাজের জন্য তিনি এক সময় স্টেট ব্যাঙ্কের চাকরি পেয়েও গ্রহণ করেন নি।

কথকতা প্রসঙ্গে বললেন - 'এক সময় বহু কথকতা কয়েছি'-এখন পূজা-আর্চা, চন্ডীপাঠ, আর গান নিয়ে এত ব্যস্ত যে কথকতা কইবার ফুরসুৎ পাই না। তবে দু'এক আসর 'কইতেই' পারি সেরকম আমন্ত্রণ এলে। জানতে চাইলাম - রামায়ণের কথকতায় সমগ্র রামায়ণ কি করতেন? চটজলদি বললেন - আমরা রামরাজা হয়ে সিংহাসনে বসা পর্যন্ত কইতাম। সীতার পাতাল প্রবেশ কইতাম না। কারণ, আমাদের এখানে রামরাজার বৃত্তান্তটাই প্রধান ছিল। লব-কুশের গান ও কথা, রামচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় ও মিলন এবং রামচন্দ্রের রাজা

হয়ে সিংহাসনে বসা - এই পর্যন্তই -।

কথায় কথায় এক পুরাতন পত্রিকা বের করে দেখালেন - পত্রিকার নাম 'তোর্য্যত্রিক', নৃত্য-নাট্য-সংগীতকলার মাসিক পত্র, সম্পাদক শ্রী শচীন্দ্রনাথ মিত্র। ১৯৬৬ সালের জুন সংখ্যা। 'বঙ্গদেশে পাখোয়াজ শিক্ষার প্রচার' প্রবন্ধে শ্রী রাজীবলোচন দে দুর্লভ ভট্টাচার্য সম্পর্কে লিখছেন - '১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সাঁতরাগাছিতে দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তিনি ঠনঠনিয়ায় তাঁর মাতুলালয়ে বসবাস করতেন। অতি শৈশবেই লক্ষিত হয়েছিল সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ। তাঁর মাতুলালয়ের কাছেই ঁমুরারীমোহন গুপ্তের গৃহে বহু গুণী বাদকের সমাগম হত এবং প্রায় গানের বৈঠক হত। দুর্লভচন্দ্র গান - বাজনার আওয়াজ পেলেই ছুটে যেতেন মুরারীমোহনের বৈঠকখানায় - শুনতেন একাগ্রচিত্তে। ক্রমে মুরারীবাবুর মৃদঙ্গবাদ্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে গুরুত্বে বরণ করলেন। অল্প কয়েক বছরেই বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গ-বাদক রূপে পরিগণিত হলেন। তাঁর জীবনাবসানের ঘটনাটি বৈচিত্রপূর্ণ। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কোলকাতার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী 'অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স' (বাংলার আদি মিউজিক কনফারেন্স)-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য সঙ্গীতানুরাগী ঁভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে একটি সঙ্গীত বৈঠক হয়। বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও অতিথিতে পরিপূর্ণ এই আসরে সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ঁললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের গানের সাথে শুরু হল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গত। সেই অপূর্ব সংযোগ অতুলনীয় অকল্পনীয়। শেষে ললিতবাবু শুরু করলেন দরবারী কানাড়া রাগের বিখ্যাত গান 'বাজত ঝাঁঝ মৃদঙ্গ'। সারা আসর যখন সুরের মায়াজালে আচ্ছন্ন হঠাৎ ললিতবাবু লক্ষ্য করলেন মৃদঙ্গ বাজছে না। তৎক্ষণাৎ তিনি বন্ধ করলেন গান। দেখা গেল দুর্লভ চন্দ্র পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। পরের দিনই তিনি দেহত্যাগ করলেন। সঙ্গীতজ্ঞের এমন মৃত্যু সচরাচর দেখা যায় না।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য একজন বিশিষ্ট ধ্রুপদী। সমগ্র বাংলা জুড়ে দুর্লভচন্দ্রের অসংখ্য শিষ্য। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রী ঁপ্যারীমোহন দাশ, ঁরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঁজীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রতাপনারায়ণ মিত্র, ডমরুপাণি ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ বাগচী, জীতেন্দ্রনাথ সাঁতরা, হরিশঙ্কর ঘোষ, হারাধন পাল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীহারাধন পাল পরে শ্রী বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এঁর কাছে ১৯২৯খ্রীষ্টাব্দ হতে আমি মৃদঙ্গ-বাদন শিখেছি। ইনি আমার প্রথম গুরু। এঁর প্রশিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রী কার্তিক সান্যাল, অনিল দে, পশুপতি দে সরকার, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ সাহা প্রভৃতি মৃদঙ্গ সাধনায় লিপ্ত আছেন। এবছর সর্বশ্রী চঞ্চল ভট্টাচার্য, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত গোস্বামী, কার্তিক (তারক) বড়াল প্রভৃতি কতিপয় তরুণ মৃদঙ্গ শিক্ষায় নিযুক্ত আছেন। ঈশ্বরের কাছে এঁদের দীর্ঘ জীবন ও প্রসিদ্ধি কামনা করি।

মুরারীমোহনের প্রশিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন পাল, কেষ্ট পাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আজকাল যদিও মৃদঙ্গ চর্চা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ তবু ওপরের তালিকা হতে দেখা যায় যে, মুরারীমোহন গুপ্তের ও তাঁর শিষ্য ঁদুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের অমূল্য দানের জন্য আজও বাংলাদেশ হতে মৃদঙ্গ চর্চা লুপ্ত হয়নি। এখনও আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্রের শতকরা ৭৫ভাগ শিল্পী এই ঘরাণার শিষ্য। শ্রী প্রতাপনারায়ণ মিত্র তো কোলকাতা কেন্দ্রে প্রথম শ্রেণীর পাওয়াজ বাদক ও সর্বজনখ্যাত।

পরিশেষে বলি, যদিও সঙ্গীতবিশারদ, সঙ্গীত-প্রভাকর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন সঙ্গীত শিক্ষায়তনে তবলা ও ধ্রুপদ-ধামার শেখাবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু মৃদঙ্গ শিক্ষার কোন আয়োজন নেই। অথচ ধ্রুপদ-ধামারের সাথে মৃদঙ্গ শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংঙ্গীত প্রতিষ্ঠানগুলি দৃষ্টিপাত করলে ও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ভারত আবার তার প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবে গৌরবাeÄত হবে।

পত্রিকা দেখার পর একটি বাঁধানো 'শুভেচ্ছা' পত্র চোখে পড়ল। শুভেচ্ছা পত্রটির লেখক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র - প্রাপক শ্রী অমরনাথ ভট্টাচার্য।

Birendra Krishna Bhadra
7, RAMDHONE MITRA LANE
CALCUTTA - 700004
PHONE - 557321

২৭.৪.৮১

শ্রীমান অমর ভট্টাচার্যের
প্রতি শুভেচ্ছা

কল্যাণীয় অমর,

তোমার চন্ডীপাঠ শুনলাম। সুন্দর আবৃত্তি করেছ। বহু স্থানে মাতৃনাম প্রচারিত হচ্ছে। আমার তাতেই আনন্দ। তুমি যে শ্রদ্ধার সঙ্গে মা চন্ডীকে অন্তর দিয়ে ডাকছ, তার ফল তুমি নিশ্চয় পাবে। বিশ্বাস করো মায়ের আশীর্বাদ পেলে ভয় নেই। অনন্ত আনন্দের মধ্যে বাস করবে। ঁমায়ের কাছে প্রার্থনা করছি - ঁমা একে আশীর্বাদ কোরো।

- শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

অমরবাবুর কাছে দেখার এবং শেখার বাকি এখনও অনেক। আজ আপাতত এই পর্যন্ত। দুপুরে গড়াতে শুরু করেছে। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। হাঁটা পথে বেতড় বাসস্ট্যান্ড। বৃষ্টি তখন মুষলধারে। কোনক্রমে বাসযোগে সাঁতরাগাছি। চলার রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে হাঁটুখানেক। জল ভেঙে রেল-স্টেশনে। বৃষ্টি মাথায় বাড়ি ফেরা।

ভিজে শরীরে আর যাওয়া হল না গৌতমবাবুর (ভদ্র) বাড়িতে। কথা ছিল কথকতা নিয়ে, কথা হবে ওনার বাড়িতে বিকেলে .....

কলের গানের কথকতা

জহর চট্টোপাধ্যায়

একটা সময় ছিল যখন পুজোর সেরা আকর্ষণ ছিল পুজোর গান। পুজো উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে কালজয়ী কত গান। এই সব গানের প্রায় সবগুলিই ছিল রেকর্ড বা ডিস্ক, যাদের বেসিক ডিস্ক বলা হত। রংচঙে কাগজের প্যাকেটে মোড়া কালো রেকর্ডের মন ভরানোর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। রবি ঠাকুরের ভাষায় বাঙালীর হৃদয়খানা তখন গ্রামোফোনের ডিস্কে ঘুরে বেড়াত। এখন আর রেকর্ড প্রকাশ না হলেও পুজোর গান ঠিকই আছে। গ্রামোফোনের ডিস্ক এখন রূপ বদলে কমপ্যাক্ট ডিস্ক। গ্রামোফোনের একটা নস্টালজিক বাংলা নাম আছে, কলের গান। যার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। স্মৃতির সরণী পথ বেয়ে একবার দেখে নেওয়া যাক কিভাবে তৈরী হয়েছিল মানব সভ্যতার এই অত্যাশ্চর্য এবং বোধহয় সবচেয়ে প্রিয় যন্ত্রটি।

শব্দ কে যে ধরে রাখা যেতে পারে তা প্রথম যাঁর মাথায় আসে তিনি হলেন এক বিস্ময় প্রতিভাধর বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কারের পর ফোনোগ্রাফ যন্ত্রই ছিল তাঁর অন্যতম সেরা আবিষ্কার। টেলিগ্রাফ যন্ত্রকে আরও উন্নত করার কাজে এডিসন যখন ব্যস্ত, তখন তিনি দেখেন যে একই খবর বারবার পাঠাবার জন্য কাগজের যে ফিতে ব্যবহার করা হয় তা পুনরায় চালাবার সময় অনেকটা মানুষের কণ্ঠস্বরের মত শোনাচ্ছে। এটা দেখে তিনি টেলিফোনের মেসেজ রেকর্ড করার কথা ভাবেন। তিনি টেলিফোনের রিসিভারের ডায়াফ্রামের সঙ্গে একটি ছুঁচ যুক্ত করে কাগজের ফিতের ওপর টেলিফোনের মেসেজ সফলভাবে রেকর্ড করেন। এবার তাঁর ভাবনা শুরু হয় শব্দকে শক্তপোক্ত কোন জিনিসের ওপর সংগ্রহ করার। সেখান থেকেই আসে টিন ফয়েল ফোনোগ্রামের ভাবনা।

১৮৭৭ সালের ২৯ নভেম্বর নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে ২৫ মাইল দূরে মেনলো পার্কের কারখানায় এডিসনের নকশাকে বাস্তবে রূপ দিলেন অভিজ্ঞ যন্ত্রবিদ জন ক্রুয়েশি। এডিসন প্রথমে যখন যন্ত্রটির নকশা তৈরী করেন তখন কোন নাম দেননি, নকশায় যন্ত্রটিকে 'এটা কথা বলতে পারে' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। ক্রুয়েশি যখন এডিসনের নকশাকে বাস্তবে রূপ দিতে ব্যস্ত, তখন কারখানার অন্য কর্মচারিদের অনেকেই ব্যাপারটাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দেয়। কারণ মানুষের কণ্ঠস্বর ধরে রাখা যেতে পারে এই ব্যাপারটাই তাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ এডিসনের আগে কেউ এমন যন্ত্র তৈরী করতে পারেননি। শব্দ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রথম সবচেয়ে বড় আবিষ্কারটির কৃতিত্ব টমাস আলভা এডিসনের হলেও তাঁরও কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। যদিও এডিসনের যন্ত্রের নকশা অনেক বেশী বাস্তব সম্মত হওয়ায় সেটি পেটেন্ট অফিস থেকে পেটেন্ট পেয়ে যায়।

যাই হোক, যন্ত্রবিদ জন ক্রুয়েশি সহকর্মীদের হাসি-ঠাট্টায় কান না দিয়ে পেতল আর লোহার চোঙ, একটি হিরের ছুঁচের মত অংশ এবং তাদের ঘোরাবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে এডিসনের কথা বলা যন্ত্রের রূপ দিতে থাকেন। যন্ত্রটির শেষ প্রান্তে শিঙের মতো একটি ধাতব শঙ্কুর পিছনে একটি ছুঁচ লাগানো ছিল। এটাই সবার কাছে মজার কারণ হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ কাজ করে ক্রুয়েশি যন্ত্রটি তৈরী করে ফেলার পর সেটিকে পরীক্ষা করার জন্য এডিসন ল্যাবরেটরিতে এলেন। ক্রুয়েশির কাজ খুঁটিয়ে দেখে এডিসন সন্তুষ্ট হলেন। এরপর তিনি যন্ত্রটির চোঙের মতো অংশটির গায়ে একটি টিনের পাতলা আস্তরণ ভালোভাবে জড়িয়ে দিলেন। আস্তরণটির শেষ প্রান্তের সঙ্গে হিরের ছুঁচালো অংশটি লাগিয়ে দিলেন। যন্ত্রটির ডানদিকের হাতলটি ধরে টিনের আস্তরণ জড়ানো চোঙটিকে এডিসন ধীরে ধীরে সমান গতিতে এমন ভাবে ঘোরাতে লাগলেন যাতে টিনের আস্তরণটির গায়ে হিরের ছুঁচটি স্থায়ী দাগ ফেলে। এবার এডিসন যন্ত্রটির সামনে একটি বিখ্যাত ছোটোদের ছড়া 'মেরী হ্যাড আ লিটিল ল্যাম' আবৃত্তি করতে থাকেন। সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে কি হয় দেখার জন্য। এডিসন যন্ত্রটি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন টিনের আস্তরণটির গায়ে আঁকাবাঁকা গভীর দাগ পড়েছে। এডিসন যা চাইছিলেন যন্ত্রটি সেই মতো ঠিকঠাক কাজ করেছে। এবার এডিসন যন্ত্রটির সেই মজাদার অংশ অর্থাৎ পিছনে ছুঁচ লাগানো ধাতব শঙ্কুটিকে টিনের আস্তরণের গায়ের আঁকাবাঁকা গভীর দাগটির একেবারে শুরুতে যোগ করলেন। চোঙটিকে হাতলের সাহায্যে আগের মতো একই গতিতে ঘোরাতে শুরু করা হলে প্রথমে কিছুটা এলোমেলো শব্দ শোনা গেল, আর তারপর সবাইকে অবাক করে হুবহু এডিসনের গলায় চোঙাটি 'মেরী হ্যাড আ লিটিল ল্যাম' আবৃত্তি করে উঠল। ল্যাবরেটারিতে উপস্থিত সকলের মতোই এডিসনও খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কারণ খুব কম ক্ষেত্রেই এমন হয়েছে যে তিনি প্রথমবারেই সাফল্য পেয়েছেন।

এবার এডিসনের ল্যাবরেটারির সমস্ত কর্মীই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে তারা এডিসনের নির্দেশ মতো যন্ত্রটির বেশ কয়েক ধাপ উন্নতি ঘটিয়ে ফেলল। শেষ পর্যন্ত ৬ ডিসেম্বর ১৮৭৭ এডিসন নিউইয়র্কের পেটেন্ট অফিস থেকে তাঁর এই আশ্চর্য যন্ত্রের পেটেন্ট নেন। ২২ ডিসেম্বরের 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকায় তাঁর এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হয় এবং গোটা বিশ্ব তাঁর 'টিন ফয়েল ফনোগ্রাফ' যন্ত্রের কথা জানতে পারে। এই আবিষ্কারের জন্য সাংবাদিকরা এডিসনের নাম দেয় 'মেনলো পার্কের জাদুকর'। দশ বছর পরে, ১৮৮৮ সালে এডিসন তাঁর ফোনোগ্রাফ যন্ত্রটির সাথে একটি ব্যাটারি চালিত মোটর যোগ করেন। ১৯১১ সাল নাগাদ হেস্টার বেল এবং চার্লস টেইন্টার এডিসনের 'টিন ফয়েল ফনোগ্রাফ' যন্ত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে যন্ত্রটিকে শব্দসংরক্ষণের আরও উপযোগী করে তোলেন।

এডিসনের আবিষ্কার অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিল আরও উন্নত মানের যন্ত্র তৈরী করার জন্য। ১৮৮৮ সালে আমেরিকার ওয়াশিংটন সিটির বাসিন্দা কুড়ি বছর বয়সী এক তরুণ জার্মান এমিল বার্লিনার ডিস্ক রেকর্ড তৈরী করেন। এর আগে ১৮৮৭ সালের ৮ নভেম্বর তিনি একটি শব্দসংগ্রাহক যন্ত্রের পেটেন্ট পান। সামান্য কেরানীর কাজ করলেও বার্লিনারের শখ ছিল টেলিফোন ও ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের নানান ত্রুটি বিচ্যুতি সারানো। এই শখ থেকেই তিনি টেলিফোন ট্রান্সমিটার তৈরী করে তার পেটেন্ট নেন এবং 'বেল টেলিফোন কোম্পানী'র কাছ থেকে এজন্য মোটা টাকা পান। এই টাকার প্রায় সবটাই তিনি গ্রামোফোন যন্ত্র তৈরীর কাজে লাগান।

পৃথিবীর প্রথম পেশাদার সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট ফ্রেডরিক উইলিয়ামস গেইসবার্গের 'মিউজিক অন রেকর্ড' বইটিতে বার্লিনারের গ্রামোফোন ডিস্ক তৈরীর বর্ণনা আছে। ১৮৯১ সালে গেইসবার্গ তাঁর বন্ধু বিল গোল্ডেনের সঙ্গে প্রথমবার বার্লিনারের ল্যাবোরেটরিতে যান। সেখানে গ্রামোফোন ডিস্কে রেকর্ড করা বার্লিনারের ভাঙা ভাঙা ইংরাজী উচ্চারণে গাওয়া 'টুইংকেল টুইংকেল লিটিল স্টার' গানটি শোনেন। এটিই গ্রামোফোন ডিস্কে করা প্রথম রেকর্ড। বার্লিনার সেদিন গেইসবার্গকে গ্রামোফোন ডিস্কে শব্দ রেকর্ড করে দেখান। শব্দগ্রহণের যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো একটি রাবারের নল তিনি গোল্ডেনের মুখের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন এবং গেইসবার্গ পিয়ানো বাজাবার জন্য তৈরী হলেন। বার্লিনার সংকেত দিতেই তাঁরা গান ও বাজনা শুরু করেন এবং তিনি নিজে যন্ত্রের হাতল ঘুরিয়ে শব্দ রেকর্ড করতে শুরু করেন। গান শেষ হলে তিনি যন্ত্রটি থেকে একটি দস্তার চাকতি বার করে এনে সেটিকে বেশ কিছুক্ষণ অ্যাসিডের মধ্যে রাখলেন। চাকতিটিকে অ্যাসিডের মধ্যে থেকে বের করে এনে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিলেন। এবার দস্তার চাকতিটিকে তিনি অন্য আর একটি যন্ত্রের ওপর রেখে হাতলের সাহায্যে ঘোরাতে লাগলেন এবং যন্ত্রটি থেকে বিলি গোল্ডেনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। গেইসবার্গ পুরো ব্যাপারটায় এতটাই মোহিত হয়ে যান যে বার্লিনারের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

প্রথম গ্রামোফোন যন্ত্রে শব্দ রেকর্ড করছেন এমিল বার্লিনার

তাঁরা দুজনে বহু দিন পর্যন্ত এক সাথে কাজ করে এই নতুন যন্ত্রটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এরপর তাঁরা একটি প্রধান ডিস্ক থেকে অসংখ্য ডিস্ক তৈরী করার পদ্ধতি আয়ত্ত করলেন। ইউরোপের বাজার ধরার জন্য বার্লিনার তাঁর এজেন্ট ডব্লু. বি. ওয়েন এবং শব্দগ্রাহক গেইসবার্গকে লণ্ডনে পাঠান। অন্য দিকে ভাইপো জো স্যাণ্ডার্সকে হ্যানোভারে পাঠান রেকর্ড তৈরীর কারখানা বানাবার জন্য। এই সময় বার্লিনারের উদ্যোগে ইউরোপ, রাশিয়া এবং ভারতসহ এশিয়ায় নানা ধরনের শব্দ সংগ্রহ করা হয়।

বার্লিনারের আবিষ্কারের ফলে সিলিণ্ডারে শব্দ গ্রহণ করা বন্ধ হয়ে চ্যাপ্টা ডিস্ক বা রেকর্ডে শব্দ গ্রহণ করা শুরু হয়। প্রথমে কাঁচের, পরে দস্তা এবং আরো পরে প্লাস্টিকের ডিস্ক বা রেকর্ড তৈরী হয়। এই চ্যাপ্টা রেকর্ডগুলিতে শব্দকে ঘড়ির স্প্রিঙের মত বাইরে থেকে ভিতরের দিকে ক্রমহ্রাসমান অবিচ্ছিন্ন বৃত্তাকার আঁকাবাঁকা গভীর দাগের আকারে সংগ্রহ করা হত। এরপর গ্রামোফোন যন্ত্রে ঐ রেকর্ডটি ঘোরানো হত। গ্রামোফোন যন্ত্রের চোঙাটির শেষ প্রান্তে একটি ছুঁচালো অংশ থাকত যেটি রেকর্ডের ওপরের ঐ আঁকাবাঁকা দাগগুলির সংস্পর্শে কেঁপে উঠত এবং ঐ কম্পনকে শব্দে পরিণত করে চোঙের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিত। সিলিণ্ডার রেকর্ডের ক্ষেত্রে একই রেকর্ডের একাধিক কপি তৈরি করা যেত না। কিন্তু বার্লিনারের রেকর্ডে সে অসুবিধা রইল না। একটি ছাঁচ থেকে ইচ্ছামত সংখ্যার রেকর্ডের কপি বানিয়ে নেওয়া যেতে লাগল। বার্লিনার গ্রামোফোন যন্ত্র ও রেকর্ড প্রচুর পরিমাণে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে 'দি গ্রামোফোন কোম্পানী' নামে একটি কোম্পানী খোলেন। রেকর্ডের বিক্রি বাড়াবার জন্য বার্লিনার দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমত, তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পীদের দিয়ে গ্রামোফোন ডিস্ক বানাবার কথা ভাবেন এবং সেইমত দুই বিখ্যাত শিল্পী এনরিকো কারুশো এবং ডেম নেলী মেলবাকে তাঁর কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ করেন। রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে পেশাদার শিল্পীদের চুক্তির প্রথম ঘটনা এটি।

ফ্রান্সিস ব্যারাউ'র আঁকা তাঁর পোষা কুকুর নিপারের ছবি

দ্বিতীয়টি হল ফ্রান্সিস ব্যারাউ'র আঁকা 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' শিরোনামের একটি ছবিকে কোম্পানীর ব্যবসায়িক চিহ্ন অর্থাৎ ট্রেডমার্ক হিসাবে ব্যবহার করা। ১৮৯৯ সালে এমিল বার্লিনার যখন তাঁর লণ্ডনের গ্রামোফোন কোম্পানীর অফিসে আসেন তখন অফিসের দেওয়ালে ঝোলানো একটি ছবি নজরে আসে। ফ্রান্সিস ব্যারাউ'র আঁকা সেই ছবিটি ছিল তাঁর পোষা কুকুর নিপারের। ছবিতে নিপার একটি গ্রামোফোন যন্ত্রের সামনে বসে তার মালিকের কণ্ঠস্বর শুনছে। ছবিটি বার্লিনারের এত পছন্দ হয় যে তিনি সেটিকে নিজের কোম্পানীর লোগো করতে চান। সেইমত তিনি ব্যারাউ'র ছবিটির একটি প্রতিলিপি আমেরিকার পেটেন্ট অফিসে পাঠান। ছবিটি ট্রেডমার্ক হিসাবে অনুমোদন পায়১৯০০ সালের ১০ জুলাই। কিন্তু ততদিনে বার্লিনারের কোম্পানী স্ব-নামেই পরিচিতি লাভ করে ফেলেছে, তাই বার্লিনার ছবিটির সত্ব তাঁর সহকর্মী এলরিজ আর. জনসনকে দিয়ে দেন। জনসন ছবিটি প্রথমে তাঁর 'ভিক্টর' রেকর্ডের ক্যাটালগে এবং পরে রেকর্ডের কাগজের লেবেলেও ছাপা শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'এর লোগো হিসাবে ছবিটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এটি পৃথিবীর সর্বাধিক পরিচিত লোগোগুলির একটি এবং আজও সমানভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

পরবর্তীকালে বার্লিনার তাঁর গ্রামোফোন যন্ত্রের সত্ব এবং রেকর্ড তৈরীর কৌশল 'ভিক্টর টকিং মেশিন কোম্পানী'কে বিক্রি করে দেন যারা পরবর্তীকালে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' বা 'এইচ. এম. ভি.' নামে রেকর্ডের জগতের সবচেয়ে পরিচিত ও জনপ্রিয় ব্র্যাণ্ড হয়ে ওঠে। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' আমেরিকায় গ্রামোফোনের সফল বাণিজ্য শুরু করলে বার্লিনার আমেরিকার বাইরে অন্যান্য দেশে গ্রামোফোন ব্যবসা শুরু করেন। কানাডার মন্ট্রিলে 'বার্লিনার গ্রাম-ও-ফোন কোম্পানী', জার্মানীতে 'ডয়েশ গ্রামোফোন', ইংল্যাণ্ডে 'গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড' নামে তিনি রেকর্ড বিক্রি করতে থাকেন।

এলরিজ জনসন বার্লিনারের গ্রামোফোন যন্ত্রে একটি স্প্রিং মোটর যুক্ত করে তার পেটেন্ট নেন। গ্রামোফোন যন্ত্রে এই মোটর যোগ করায় ডিস্কের গতিতে স্বাচ্ছন্দ এল এবং শব্দ আগের থেকে বেশী শ্রুতিমধুর হয়ে উঠল।

গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডের লেবেল

এডিসনের 'টিন ফয়েল ফনোগ্রাফ' যন্ত্রটি আবিষ্কারের এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসেই কলকাতায় চলে আসে। ১৮৯৫ সালে ভারতে এইচ. এম. ভি. কোম্পানীর প্রথম ডিলার দিল্লীর 'মহারাজা লাল এণ্ড কোং' স্থাপিত হয়। সেই সময় তারা সিলিণ্ডার রেকর্ড বিক্রি করত। এই রেকর্ডগুলি মেয়েদের হাতের চুড়ির গোছার মতো দেখতে ছিল। কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী অধ্যাপক হেমেন্দ্র মোহন বসু এডিসনের ফোনোগ্রাফ যন্ত্র এদেশে আনিয়ে প্রথমে 'এইচ. বোস রেকর্ডস' এবং পরে 'প্যাথে-এইচ. বোস রেকর্ডস'এর ব্যানারে সিলিণ্ডার রেকর্ড তৈরী করা শুরু করেন। কলকাতায় তৈরী এই রেকর্ডকে 'বোসের রেকর্ড' বলা হত। ১৮৯৮ সালে হেমেন্দ্র মোহন বসুর 'দ্য গ্রামোফোন অ্যাণ্ড টাইপরাইটার লিমিটেড' কোম্পানির বেলেঘাটার কারখানায় ভারতে প্রথমবারের জন্য গান রেকর্ড করা হয়। প্রথম কোন শিল্পীর গান রেকর্ড করা হয়েছিল সে বিষয়ে সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে। ১৮৯৯ সালে লণ্ডনে প্রথম কোন ভারতীয়র কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হয়। ৭ ইঞ্চি ব্যাসের ডিস্কের একদিকে রেকর্ড করা হয়। মোট ৪৪ টি রেকর্ডে ক্যাপ্টেন ভোলানাথ, ড. হরনামদাস এবং আহমেদ নানা ভাষায় গান ও আবৃত্তি করেন। এই রেকর্ডগুলি কোন সংগ্রাহকের কাছে না পাওয়া গেলেও ১৯০৪ সাল পর্যন্ত গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত বিদেশী রেকর্ডের তালিকায় এই ৪৪ টি রেকর্ডের উল্লেখ আছে। ১৯০২ সালের ২৭ অক্টোবর ফ্রেডরিক জেইসবার্গ এক দেশীয় শিল্পীর গান রেকর্ড করার জন্য জার্মানি থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল গান রেকর্ড করে হ্যানোভারে পাঠানো এবং সেখান থেকে গানের 'ডিস্ক রেকর্ড' বানিয়ে কলকাতায় বিক্রি করা। যতদূর জানা যাচ্ছে, জেইসবার্গ ১৯০২ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতার একটি থিয়েটার হলে গহরজানের গান রেকর্ড করেন।

১৮৮৯ সালে জার্মানীতে তৈরী পৃথিবীর প্রথম গ্রামোফোন যন্ত্র

১৯০১ সালে জে. ডব্লু. হড্ কলকাতায় এসে শাখা অফিস খোলেন এবং ১৯০২ সালে এফ. ডব্লু. গেইসবার্গ এই অফিসে আসেন। প্রথমবার ভারতে এসে তিনি প্রায় ৫০০ গান রেকর্ড করেন। এই রেকর্ডিংগুলি সবই জার্মানির হ্যানোভারে বার্লিনারের রেকর্ড তৈরীর কারখানায় পাঠানো হয়। সেই সময় তথ্য সংরক্ষণ এবং রেকর্ডের ওপর শিল্পীর নামসহ কাগজের লেবেল তৈরীতে সুবিধার জন্য গায়ক বা গায়িকাকে গানের শেষে নিজের নাম বলতে হত। এই পদ্ধতি জার্মান যন্ত্রবিদদের রেকর্ডকে বিক্রির উপোযোগী করে তৈরী করতে খুব সাহায্য করেছিল। এই সময়ের বেশিরভাগ রেকর্ডেই 'মেড ইন জার্মানি, হ্যানোভার' কথাটি ছাপা থাকত। প্রথমদিকের রেকর্ডগুলিতে শিল্পীর নামের জায়গায় 'নাচ গার্ল', 'বাইজি' বা 'কোঠাওয়ালি' লেখা হলেও পরবর্তীকালের রেকর্ডগুলিতে 'গহরজান অফ্ ক্যালকাটা', 'জানকীবাঈ অফ এলাহাবাদ', 'পিয়ারা সাহিব' ইত্যাদি পরিচয় ছাপা হত। সেকালের রেকর্ড করা সব গানই ছিল এই ধরনের শিল্পীদের ।

গেইসবার্গের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে ভদ্র ঘরের মহিলারা গান রেকর্ড করতে চাইতেন না বা তাদের দিয়ে রেকর্ড করানো মোটেই সহজ ছিল না। যার গান রেকর্ড করা হত গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হত ঠিকই কিন্তু ইউরোপের শিল্পীদের তুলনায় তা খুবই সামান্য ছিল। কারণ এদেশে গান রেকর্ড করার খরচ ছিল ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশী। তাই সেকালের অনেক নামকরা শিল্পী যাঁরা দেশ জুড়ে মুজরার ডাক পেতেন তাঁরা গান রেকর্ড করলে নিজের বাজার দর ঠিক রাখতে রেকর্ডে নিজের নামের সঙ্গে 'অ্যামেচার কথাটি' ছাপার জন্য জোর দিতেন।

১৯০৬ সালে প্রকাশিত কোম্পানির ক্যাটালগ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেকগুলি সিলিণ্ডার রেকর্ডের কথা জানা যায়। যদিও কবির স্বকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' গানের রেকর্ডটি ছাড়া আর কোনও রেকর্ডের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

প্রথমে দস্তার ডিস্কে রেকর্ড করা হলেও পরবর্তীকালে মোমের তৈরী ডিস্কে রেকর্ড করা শুরু হয়। মোমের প্রধান ডিস্ক থেকে লাক্ষার তৈরী অসংখ্য রেকর্ড তৈরী করা যেত। ভারতে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষার চাষ হত। তৎকালীন বিশ্বের মোট লাক্ষা উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতে উৎপন্ন হত। সে সময় ভারতে বছরে ১৫,৭০০ মেট্রিক টন লাক্ষা উৎপন্ন হত। গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানীগুলির চাহিদা পূরণ করতে তৎকালীন বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশে প্রচুর লাক্ষার চাষ হত। দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে ভারত ছিল লাক্ষা রপ্তানিকারী পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ। লাক্ষার সহজলভ্যতার কারণে ১৯০৮ সালে কলকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলে রেকর্ড তৈরীর কারখানা তৈরী হয়। এই কারখানা গড়ে ওঠার পর আর রেকর্ড তৈরীর জন্য মোমের রেকর্ডগুলিকে জার্মানি পাঠানোর দরকার হল না। এই রেকর্ডিং কারখানায় প্রধান বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার হত হারমোনিয়াম। হারমোনিয়ামকে সাধারণ লোকে বলত 'বাজা', আর সেই থেকে এই রেকর্ডিং কারখানার নাম হয়ে যায় 'বাজাখানা'।

১৯১০ সাল পর্যন্ত সিলিণ্ডার রেকর্ডের বাজার ছিল। এই সময় গ্রামোফোন এবং নিকোল কোম্পানীর ডিস্ক রেকর্ড বাজারে চলে আসে, সিলিণ্ডার রেকর্ডের দিন শেষ হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতের কোন সংগ্রাহকের কাছেই সিলিণ্ডার রেকর্ড বা টিন ফয়েল ফনোগ্রাফ যন্ত্রটি নেই। কেবল দু'একটি সংগ্রহশালায় কয়েকটি ভাঙাচোরা সিলিণ্ডার রেকর্ড আর টিন ফয়েল ফনোগ্রাফ যন্ত্রের অবশেষ রয়ে গেছে।

গ্রামোফোনের বিজ্ঞাপন

ভারতের বিশাল বাজার ধরতে সেই সময় জার্মানি থেকে অনেকগুলি গ্রামোফোন কোম্পানী এদেশে ব্যবসা করতে আসে। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত ৭৫ টি লেবেল বা ব্রাণ্ডের রেকর্ড ভারতের বাজারে পাওয়া যেত। এদের মধ্যে 'নিকোল', 'ইউনিভার্সাল', 'নিওফোন', 'এল্ফোন', 'এইচ. বোস', 'বেকা', 'কমলা', 'বীণাপাণি', 'রয়্যাল', 'রাম-এ-ফোন', 'জেমস্ অপেরা', 'সিঙ্গার', 'সান', 'ওডিওন' প্রভৃতি ছিল নামজাদা লেবেল বা ব্রাণ্ড। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কোম্পানীগুলি হয় উঠে গেছে না হয় গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে মিশে গেছে। ১৯১৬ সালে বাজারে আসে গ্রামোফোনের জগতে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্র্যাণ্ড 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' বা 'এইচ. এম. ভি.'।

বেগম সুফিয়া কামাল ঃ শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

অনেক করুণ ও বেদনাদায়ক ঘটনার অভিঘাতে ও বেদনার নিঃসরণে গড়া বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-'৮৮) অজস্র সৃজনশীল সাহিত্যের রচয়িতা না হলেও বাংলা কবিতার ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা সবিশেষ স্মরণীয়। তিনি 'সাঁঝের মায়া'(১৯৩৮),'মায়া কাজল'(১৯৫১), 'মন ও জীবন'(১৯৫৭), 'প্রশস্তি ও প্রার্থনা'(১৯৬৮), 'অভিযাত্রিক', 'মৃত্তিকার ঘ্রাণ', 'উদাত্ত পৃথিবী' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হলেও মূলত প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। 'কেয়ার কাঁটা'(১৯৩৭) নামে বেগম সুফিয়া কামালের একটি গল্পসংগ্রহ আছে।

তাঁর 'সাঁঝের মায়া' বিরহ বেদনার কাব্য। বিষাদের সুরে ছত্রগুলি অনুরণিত। প্রকৃতির মূক বেদনার সঙ্গে কবি আপন হৃদয়ের বিরহ বেদনার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন। ভাবের অভিব্যক্তিতে আলোচ্য কাব্যে রবীন্দ্রপ্রভাব অনুপস্থিত নয়। 'মায়া কাজল' এবং 'মন ও জীবন' কাব্যের কবিতায় প্রকৃতি তার সত্যসুন্দর রূপ ও হৃদয় বেদনা নিয়ে যেন উপস্থিত। কবির প্রকাশভঙ্গিতে স্নিগ্ধ শিল্পমাধুর্য অভিব্যক্ত।

বেগম সুফিয়া কামালের জীবন খুব একটা মসৃণ নয়। বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ পরগণায় মাতামহ সৈয়দ মুয়াজ্জম হোসেনের গৃহে তাঁর জন্ম। সুফিয়া কামালের পিতা নোয়াখালী জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর নাম সৈয়দ আবদুল বারী। তিনি ছিলেন বি.এল. এবং ইংরেজী, উর্দু, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, পালি, বাংলা ইত্যাদি ভাষা জানতেন। সুফিয়া কামালের বাল্যকাল যে পরিবারে অতিবাহিত হয় সেই পরিবারের সকলেই শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং একটা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যেই তাঁর কবিমানস গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সমকালীন অন্যান্য মুসলিম পরিবারের আভিজাত্য ও রক্ষণশীলতার বাতাবরণ তাঁর মাতুলালয়ে বিদ্যমান থাকায় সুফিয়া কামালের পক্ষে ইংরাজী, বাংলা ভাষা চর্চা বা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু সুফিয়া কামাল আপন চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের জোরে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং প্রচলিত পুঁথি সাহিত্যের রস সংগ্রহ ও আস্বাদন করতেন। স্বাভাবিক ভাবে পরবর্তীকালে তাঁর মন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি বাংলা সাহিত্যের মর্মকোষে প্রবেশে সচেষ্ট হন। বাংলাদেশের পথ-ঘাট, নদী-নালা, তার প্রাকৃতিক অফুরন্ত সৌন্দর্য সুফিয়া কামালের কবিমনকে বিকশিত করে তোলে।

বেগম সুফিয়া মাত্র এগারো বছর বয়সে সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নেহাল হোসেন শিক্ষিত, সাহিত্যমনা ও সংস্কৃতি অনুরাগী হওয়ায় সুফিয়া কামালের পক্ষে সাহিত্য রচনার অনুকূল পরিবশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সৌভাগ্য সুচিরস্থায়ী হয় নি; দাম্পত্য জীবনের অতি অল্পকালের মধ্যে বেগম সুফিয়া কামালকে বৈধব্য বরণ করতে হয়। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে তিনি আর্থিক দুর্দশার সম্মুখীন হন এবং জীবিকা সংস্থানের জন্য তাঁকে রুগ্না জননী ও শিশুসন্তান সহ কলকাতায় চলে আসতে হয় এবং কলকাতা করপোরেশনের অধীনে শিক্ষয়িত্রীর কাজে তিনি যোগদান করেন। দারিদ্রের অভিশাপ, কাজের চাপ ইত্যাদির জন্য তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে সুফিয়া কামাল কামালউদ্দিনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিণীতা হন। এর ফলে কবির জীবনে - সাহিত্য সংস্কৃতির জীবনে নবসূর্যোদয় সম্ভব হল। কবির লেখনীর ধারা অবিরামগতিতে প্রবাহিত হয় এবং সাহিত্য সমাজে তিনি সুপ্রতিষ্ঠাতা হন।

বেগম সুফিয়া কামালের জীবন বেদনাদায়ক করুণ ঘটনার সমাবেশে পূর্ণ। কে বা কারা তাঁর তরুণ পুত্রকে হত্যা করে। এই নিদারুণ ঘটনা কবিকে নির্মম বেদনার শেলবিদ্ধ করে। কিন্তু সমস্ত আঘাত ও বেদনার উর্দ্ধে সমাসীন হয়ে, ব্যথাকে অন্তর্লীন রেখে কাব্যচর্চায় নিরত হন। সুফিয়া কামালের কবিমানসের পটভূমিকায় আছে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনা। আর সেই জন্যই তাঁর কাব্যে বিষাদময়তার সুর প্রতিধ্বনিত। প্রতিকূল বিদীর্ণ পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে, বিচ্ছেদকাতর মনোবেদনাকে তিনি প্রশান্ত চিত্তেই বহন করেছেন। তবুও আজন্ম বিষাদের আবহে লালিত কবি-মনের অনুভূতি উপলব্ধি তাঁর কবিতাকে করেছে বিষাদ প্রতিমা। আসলে সুফিয়া কামাল বিরহের কবি। তাঁর লেখায় বিরহের স্নিগ্ধ ব্যথা প্রকাশিত। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিরহ কবি অক্ষয়কুমার বড়াল ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্যের সমপর্যায়েই সুফিয়া কামালের 'সাঁঝের মায়া' ও 'মায়া কাজল'

কাব্যকে মান্য করা চলে।

অবশ্য 'উদাত্ত পৃথিবী' কাব্যে কবি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কবি। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে তাঁর ব্যক্তি জীবনের সংঘাতময় অভিজ্ঞতার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। এখানে বাকপ্রতিমা গঠন অথবা আলঙ্কারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুপস্থিত। রোমান্টিক জীবনাবেগের প্রাঞ্জল প্রকাশ আছে এ কাব্যে। আঙ্গিকের দিক দিয়ে সুফিয়া কামালের কাব্যসাধনা রবীন্দ্র নজরুল প্রভাবিত হলেও তাঁর রচনাকুশলতা ও প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতার জন্য তাঁর কাব্যে স্বকীয়তার ছাপ আছে বলেই তা চিরসমাদৃত হবে।

বেগম সুফিয়া কামালের কাব্যকলার প্রধান হল প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যকণার অভিব্যক্তি। শ্যামল শোভা পরিবৃত বাংলাদেশের নিরাসক্ত প্রকৃতি কবির বিমুগ্ধ চেতনায় অতি সহজ সাবলীল ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। কবি তাই গভীর সহানুভূতি ও মমতায় আপ্লুত হয়ে প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ সৌন্দর্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই সৌন্দর্য যাতে পরিপূর্ণ শিল্পসত্তার বিকাশ লাভ করে সেদিকে তাঁর শিল্পীমন ছিল পরিপূর্ণ সজাগ। ভাবে, ব্যঞ্জনায় ঐশ্বর্যদীপ্ত ভাষায় ও কাব্যিক মাধুরীপ্রলেপে বাংলার ষড়ঋতুর ছবি কবি এঁকেছেন তাঁর 'মন ও জীবন' কাব্যে।

আমি কবি বসন্তের পুলক জাগিল মনে প্রাণে --
রূপে, গন্ধে, আলোকের আনন্দে ভরিল কণ্ঠ গানে।
আমি কবি নিদাঘের, যত তার দাবদাহ জ্বালা
বক্ষে ধরি, কণ্ঠে পরি মাধবী লতার গাঁথা মালা।
আমি কবি বরষার, আষাঢ়ের মেঘ ও কড়কা
আমার নয়ন ভরে শ্রাবণ নিশীথ জাগি একা
আমি শরতের কবি, ধান্যশীর্ষে রক্তনীলোৎপলে
আকাশের ছায়া পড়ে আঁখি মোর ভরে আঁখিজলে।
হেমন্তের কবি আমি, হিমাচ্ছন্ন ধূসর সন্ধ্যায়
গৈরিক উত্তরীয় টানি মিশাইয়া রহি কুয়াশায়।

বসন্ত -সন্ধ্যায় মৌন প্রকৃতির মধ্যে ফুটে ওঠে বিদায় বেলার বিষণ্ণতার ছাপ, কবি আপন অন্তরের উপলব্ধির সঙ্গে তার সাযুজ্য কল্পনা করেছেন। বিদায়ী সূর্য তার সমস্ত ঐশ্বর্য সান্ধ্য প্রকৃতির মধ্যে উজাড় করে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। সন্ধ্যা-রশ্মির বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ কিরণে প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বর্ণের অপরূপ সমারোহ; বিধাতার চরণে কবির নিবেদন, জীবনের শেষ দিনে যখন সমস্ত কর্মের অবসান ঘটবে, তখন যেন সন্ধ্যাবেলার বিদায়ী সূর্যের মতোই নিঃশেষে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে মহৎ জীবন লাভ করতে পারেন। অস্তমিত সূর্যের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন ঃ

অনন্ত সূর্যাস্ত অন্তে আজিকার সূর্যাস্তের কালে
সুন্দর দক্ষিণ হস্তে পশ্চিম দিক প্রান্তভালে
দক্ষিণা দানিয়া গেল বিচিত্র রং -এর তুলি তার,
বুঝি আজ দিনশেষে নিঃশেষে সে করিয়া উজাড়
দানের আনন্দে গেল শেষ করি মহাসমারোহে।

বেগম সুফিয়া কামালের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভাষার সারল্য এবং সুরুচি সম্পন্ন ভাব ও সংযত বাণীভঙ্গি। বেদনার বাণীর প্রকাশকল্পে কবির ভাষায়ও করুণ কোমল গীতমাধুরীর প্রকাশ সংলক্ষ্য। বাংলা সাহিত্যের মহিলা কবিগণের মধ্যে কামিনী রায় যে একটি করুণ রাগিণীর স্নিগ্ধ পরশ সুরের সৃষ্টি করেন পরবর্তীকালে সুফিয়া কামালের হাতে তাই সত্য সুন্দর হয়ে রূপ লাভ করে। উনিশ শতকের কবিদের মধ্যে যদিও এই বেদনাবোধ সুলভ, তথাপি সুফিয়া কামালের কাব্যে তা বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত। তাঁর কাব্যমহিমা রবীন্দ্র-পরিমন্ডলে থেকেও আপন মহিমা, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতিপ্রেম, বিষাদ ও রোমান্টিকতার আবেশে পূর্ণ।

অভিমান

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

নৈঃশব্দের পাহাড়
ভাঙতে ভাঙতে
পেয়েছি পরিচিত
শব্দের সন্ধান।
দেখেছি নিস্তব্ধ পৃথিবী
অচেনা নক্ষত্রলোকে
ফুটেছে তোমারি
সহস্র নাম
হৃদয়ের শোকগাথা
নীরব শূন্যতা
অন্ধকারে ঝরে পড়া
স্নিগ্ধ অভিমান।

রবি-ইন্দ্র-নাথ

প্রতিম চ্যাটার্জী

সার্ধ হল সাঙ্গ
অপেক্ষা এখন সহস্রার্ধ।
জানি তুমি থাকবে না
আমি থাকব না-হে নাথ।
শুধু থাকবে রবি, আর থাকবে
বিশ্বশান্তি, মন শান্তির মন্ত্র নিয়ে
রবীন্দ্রনাথ।।

আস্তিকতা -- নাস্তিকতা

প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য

ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রশ্নে এই জগত মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। একপক্ষ বলে সমগ্র জগত এবং মানুষসহ সমস্ত জীব ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং এই জগতের ভাল-মন্দ সবকিছুই এই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। অন্যপক্ষ বলে, মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি করেছে এবং তার ভালমন্দের জন্য কেবলমাত্র সে-ই দায়ী। স্বর্গবাসী কোন ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ জগতের ভাল-মন্দের জন্য দায়ী নয়। আর জীবজগত সহ এই জগতসৃষ্টির পিছনে কাজ করছে প্রকৃতির কিছু বল (Force) যা বিভিন্ন নিয়ম ও সূত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় - যেমন মহাকর্ষ বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, দুই পক্ষের তূণেই আছে নানারকম যুক্তির আয়ুধ। সেই অস্ত্রের ব্যবহার উভয়পক্ষই করে আসছে বহুদিন ধরেই। কিন্তু এই তর্কের শেষ হয়নি। মনে হয়, মানবসভ্যতা যতদিন থাকবে এ তর্কের অবসান হবে না। তাহলে যে তর্কের অবসান হবে না তার পিছনে সময় ও শক্তির অপচয় করে লাভ কি? বরং সকলেরই উচিত সেইসমস্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করা যা নিয়ে ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বর বিরোধীদের কোন বিবাদ নেই। যা নিয়ে উভয়দলই সহমত পোষণ করেন। আসুন, এই বিষয়গুলি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি।

১. যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁরা মানেন এবং বলেনও যে, ঈশ্বরের রাজ্যের প্রথম নিয়ম হলো শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা।

ঈশ্বরবিরোধীরাও নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে একমত হবেন যে, একটা জাতির তথা দেশের সমৃদ্ধির পিছনে অবশ্যই এই দুটি ব্যাপারের অবদান আছে।

২. ঈশ্বরের মহত্ব নিয়ে যে সব ধর্ম ও সম্প্রদায় সোচ্চার তাঁরা একটি বিষয়ে নিঃসংশয়। তা হলো - মানুষকে অগ্রাহ্য করে, মানুষকে ঘৃণা করে, মিথ্যা কথা বলে, দম্ভ বা অহংকার বজায় রেখে, মানুষের ক্ষতি করে ঈশ্বরের সেবা করা যায় না। তাঁরা মানেন যে, ''জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।''

যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা কি অন্যরকম ভাবেন? অন্য কোন ধর্ম নয়, তাঁরা তো মানবধর্মেই বিশ্বাসী!

৩. যাঁরা পরমধার্মিক, তাঁরা বলেন -- ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে গেলে প্রথম দরকার দেহ ও মনের শৌচ। দেহের শৌচ মানে শরীরটাকে পরিষ্কার রাখা, কাচা কাপড়জামা পরা ইত্যাদি। আর মনের শৌচ হলো, ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ, লালসা, কামুকতা, প্রবঞ্চনা ও দম্ভ থেকে মনকে দূরে রাখা, তাতে মন পরিষ্কার থাকবে, একাগ্র হবে, মনের জোর বাড়বে।

শরীর ও মন ভাল রাখার এমন তত্ত্বে কি ঈশ্বর-অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন না?

৪. ঈশ্বরবিশ্বাসীরা বলেন, ''তুমি তোমার কাজটা ভাল করে কর, ফলের আশা কোরনা, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, ভাব নিজের জন্য নয়, কাজটা করছ ঈশ্বরের জন্যই। তুমি নিশ্চয়ই সফল হবে। তাঁরা কখনই বলেন না, তুমি কর্ম ত্যাগ করে কেবলমাত্র প্রার্থনা কর আর ঈশ্বরের চরণে পূজা দিয়ে যাও, তাহলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। কিংবা বলেন না যে মাঠে বীজ ঢেলে ঘরে গিয়ে দেবতাকে নৈবেদ্য প্রদান কর। মাঠে গিয়ে পরিশ্রম করার কি দরকার? তাহলেই দেখবে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে তোমার জমি ফসলে পূর্ণ করে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের নামে যাঁরা ভ্রু বা নাক কুঁচকোন তাঁরা কি বলেন? বলেন - আমাকেই যখন সব করতে হবে, পরিশ্রম করে মুখের রক্ত তুলে ঘাম ঝরিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে হবে তখন খামোকা ঈশ্বর-ভজনা করবো কেন? এখানে ঈশ্বরের স্থান কোথায় আর তাঁর ভূমিকাই বা কি?

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর আছেন বা নেই এই নিয়ে কোন কূট-তর্কের দরকার নেই। সফল ও সুন্দর জীবনযাপন করবার কতকগুলো স্বাভাবিক নিয়ম আছে। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়দলের ক্ষেত্রেই সেটা প্রযোজ্য। নিজের তথা জাতির উন্নতির জন্য, সমৃদ্ধি লাভের জন্য, সুখে ও শান্তিতে থাকার জন্য সেই নিয়মগুলো মেনে চলতেই হবে। কাজ না করে, বিশৃঙ্খলভাবে জীবন কাটিয়ে, মনের মধ্যে যাবতীয় নেগেটিভ গুণ যেমন লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা, ক্রোধ, শঠতা ইত্যাদি বজায় রেখে মন্দিরে বা বাড়ীতে কেবলমাত্র ঈশ্বর ভজনা করে কেউ শান্তি ও আনন্দ পেতে পারে না। তেমনি আবার ''ঈশ্বর বলে কিছু নেই'' - এই তর্কে প্রবৃত্ত হওয়াটাও নিজের মূল্যবান সময় ও শক্তি নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ যদি ঈশ্বরকে কল্পনা করে মনের শক্তি লাভ করতে পারে, তবে শ্রদ্ধাসহকারে তাকে সেটা করতে দেওয়াই উচিত। পাশাপাশি, কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না বলে তার প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করা বা জোর করে তাকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করাতে যাওয়াটাও চরম অসভ্যতা ছাড়া আর কি?

রুপোর পেনড্যান্ট-এ দুর্গা, ১৮ শতকের

মস্ত কলন্দর

সুমহান ব্যন্দ্যোপাধ্যায়

মফস্বল বা গ্রামে যাদের জীবন কেটেছে বা কাটছে তাদের স্মৃতিতে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে চলা একটি লোকের পেছনে লটর পটর করতে করতে এগোনো একজোড়া বাঁদরের ছবি নিশ্চিতভাবেই ধরা আছে। কখনও কখনও ব্যস্ত শহরের রাস্তায় তারা এসে ছিটকে পড়ে। যদিও এখন তাদের খুব বেশি আর দেখি না। ছোটবেলায় আর পাঁচটা নষ্টালজিক ছবির মতো এরাও বোধ হয় একদিন হারিয়ে যাবে।

'আমাদের পরে এসব আর কেউ করবে না'। বলেছিলেন মুসলিম কলন্দর। বছর পঞ্চান্ন বয়েসের, কাঁচাপাকা চুলের দোহারা চেহারার মুসলিম তিরিশ বছর ধরে বাঁদর খেলা দেখাচ্ছে। পদবীটি খেয়াল করার। কলন্দর। যারা বাঁদর, ভালুক এসবের খেলা দেখায় তাদের উপাধি কলন্দর। ধর্মে মুসলিম। শ্রেণি সুন্নী। নিয়মিত নমাজ পড়া, একমাস রোজা রাখা বিধিসম্মত আচার পালন করা নিষ্ঠাবান মুসলিম। হুগলী জেলার পান্ডুয়ার বালিখাদের পাশে তাদের বসতি। সাত আটঘর আছে যারা পেশাগত ভাবে কলন্দর। মুসলিমের জন্ম পান্ডুয়ায় হলেও, তার বাবা এসেছিলেন বিহার থেকে। তিনিও দেখাতেন বাঁদর খেলা। সঙ্গে থাকত ভালুক। এখন সরকারী বিধিনিষেধে ভালুক খেলা দেখানো বন্ধ হয়ে গেছে। তার বাবার কাছে শিখেছিলেন বাঁদর খেলা দেখানো। ভালুক খেলা দেখানোও শিখেছিলেন, কিন্তু এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে।

মুসলিম কলন্দরের দুটো বাঁদর - কেষ্ট আর পিঁয়াজকলি। দুটোই মেয়ে বাঁদর, কেষ্টর বয়েস ষোল বছর। বয়সের ভারে একটু স্থবির। গায়ে জামা।

'কেষ্টকে কিনেছিলাম শিলিগুড়ি থেকে। একজোড়া কিনেছিলাম। বারোশো টাকা নিয়েছিল।'

বাঁদর বিক্রির কী কোন বাজার আছে? মুসলিম বলল 'না'। 'খোঁজ খবর' রাখতে হয়। মূলতঃ উত্তরবঙ্গ থেকেই সংগ্রহ করা হয় খেলা দেখানোর বাঁদর। পিঁয়াজকলি তুলনায় অল্প বয়সী। এর গায়ে অবশ্য কোন জামা নেই। পিঁয়াজকলি গায়ে জামা রাখতে দিতে চায় না। ছিঁড়ে ফেলে। এখন নাচের সিংহভাগই করে পিঁয়াজকলি। বাঁদরগুলোকে নিজের সন্তানের মতো দেখেন মুসলিম। সকালবেলা উঠে, এদের স্নান করিয়ে ভিজে ছোলা খাওয়ান। দু'জনের জন্য বরাদ্দ দেড়শো গ্রাম ছোলা। তারপর ভাত খাইয়ে, নিজে স্নান খাওয়া করে বেরোনো। বাঁদর কিন্তু সম্পূর্ণ নিরামিষ খায়। ভাত-ডাল আলুর তরকারি এইসব। কখনও সখনও দুধভাত কলা এইসব।

সারাদিন পথে, হাটে বাজারে ঘোরা। গৃহস্থের পাড়ায়, বাড়ির উঠোনে; রাস্তার মোড়ে লোকের ফরমাস মতো খেলা দেখানো। কখন বসে ওঠা 'বাবুকে নমস্কার কর'। বাঁদর দু'হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গি করে। 'বাবু কী কিছু দিল?' এরপর প্রশ্ন। বাঁদর ঘাড় নাড়ে। দেয় নি। বলে, ভালো করে বল। বাঁদর এসে পা জড়িয়ে ধরে। বাবুর দেওয়া ষোলআনা, পাঁচটাকা, দশটাকা মালিকের হাতে দিয়ে দেয়। এভাবেই সারাদিন ঘুরে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফেরা। সাধারণত এমন দূরত্বে যাওয়া হয়, যাতে সন্ধ্যে বা রাতের মধ্যে ফেরা যায়। নিতান্ত বাধ্য না হলে বাইরে রাত কাটায় না। তবে গরমকালে বেশি ঘোরা যায় না। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নিতে হয় ছাওয়ায়। বাঁদরের না হলে শরীর খারাপ হবে। হয়ও। কাশি, জ্বর, পেটখারাপ, কিছু খেতে চায় না। তখন দোকান থেকে ওষুধ কিনে খাওয়াতে হয়। প্রয়োজন হলে মানুষের ডাক্তারও দেখানো হতে পারে। এভাবেই দিন কাটে। নিত্য দিনের রুটিনে খুব বেশি ফারাক হয় না। রাস্তায় ডুগডুগ করতে করতে এগোয় কলন্দর। পেছনে বাঁদর। একটু ভিড়ে, রাস্তার মোড়ে, প্লাটফর্মে, কলন্দরের বাজনার দ্রুত ঝটপট শোনা যায়, তারপর কথা-গান-আর বাঁদরের নাচ।

''তা বাবুরা বলল আজকার দিনে মানুষের কথা কি মানুষ শোনে, বাবার কথা কি শোনে? (বাঁদর ঘাড় নাড়ে)। তারপর কি খেলা দেখাবি, সকালে বাবুরা কেমন বাজারে যায়। মাছ কিনবি, কলা কিনবি, কেমন বাজারে যাবি। (বাঁদর হাঁটতে হাঁটতে কলন্দরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে বাজার যেতে লাগল। তার গলায় সাদা সুতোর মোটা বকলেশ (মালা) , এর সঙ্গে লোহার রিং বাঁধা, রিং এর সঙ্গে হুক লাগানো, তার সঙ্গে লাগানো নাইলনের দড়ি। এ দড়ি ধরা থাকে কলন্দরের হাতে। অন্য হাতে ছপটি, যা দিয়ে নির্দেশ দেয় কলন্দর, লাঠি নাচায়। দড়িতে কমবেশি টান দেয়। প্রশিক্ষিত বাঁদর নাচতে থাকে। কলন্দর গান ধরে।)

জিন্দেগী কা নাম দোসিতিই
দোসিতি কা নাম জিন্দেগী .....

বাজার করি আসছিস; আসার সময় মাতাল লোকের সঙ্গে দেখা হয়। মাতাল লোকের নেশা কেমন লেগে যায় .....

(সঙ্গে সঙ্গে পিঁয়াজকলি মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে থাকে)। তবে বেশি নিশা লেগে যায় তবে মাতাল লোক কিভাবে রাস্তায় পড়ে যায়।

(বাঁদর নেতিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকল)

ও মাতাল, এটি নেশা করার, মাতলামি করার জায়গা নয়। উঠে বসো। এখুনি ফোন করবে পুলিশকে ডাকবে।

(বাঁদর উঠে পড়ল)

তো বাবু বলল একটু শাহরুক খানের নাচ দেখাও .....

আ নাচ মেরে বুলবুল
তো পয়সা মিলে গা

কাহা কাদার দান তো এয়সা মিলে গা
নাচ মেরে বুলবুল .....
(বাঁদর ঘুরে ঘুরে নাচে)
একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
(লাঠির ডগার উপর উঠে পড়ে)
মোসম রঙ্গিলা হ্যায় .....

এই হল শাহরুক খানের নাচ, এবার দেবের নাচ দেখাও।
(এবার লাফিয়ে লাফিয়ে নাচে। সামনের লাঠির উপর দিয়ে লাফিয়ে যায়। ব্যাক ভল্ট করে।)

এই নাচ মেরে বুলবুল .....

এবার চলে আয়। বাবুর কাছে যা, পয়সা চা। সংসার ভালো চলছে?(বাঁদর ঘাড় নাড়ে) ছেলে মেয়েদের খেতে দিতে পারবি? (বাঁদর আবার ঘাড় নাড়ে) বাবুকে বল।''

বাঁদর এগিয়ে এসে বাবুর প্যান্ট ধরে। পা ধরে। এর অর্থ পয়সা দাও। আশপাশে সবার কাছে এভাবে যায় এভাবে দিনে একশো দেড়শো টাকা রোজগার হয়।

একটা বাঁদরকে খেলা দেখানোর ট্রেনিং দিতে আট ন-মাস লাগে। যত্ন করে রাখলে পঁচিশ ত্রিশ বছর বাঁচে এরা। তবে ভালো ভাবে খেতে দিতে হবে, বিশ্রাম দিতে হবে। সপ্তাহের একটা দিন অবশ্য নিয়মমতো এদের বিশ্রামের দিন, বৃহস্পতিবার। এদিন বাঁদর খেলা দেখাতে বেরোয় না কলন্দর। বাঁদরকে ভালো করে খাওয়ায়, গায়ে শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করায়। বাঁদর নিয়ে আলাদা কোন সংস্কার নেই। তবে বজরংবালির থানে পুজো দেয়। বাঁদর তারই অংশ বলে মানে।

বাঁদর খেলা শুধু বাঁদরের একার পারফরমেন্স নয়; কলন্দরও এখানে পারফরমার। এটি লোককলাও বটে। নাগরিক লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। অবশ্য এটি লোকসংস্কৃতির গ্রামীণ নাগরিক বিভাজনকে অস্বীকার করে। একই সঙ্গে গ্রাম ও নগরের দর্শকদের মনোরঞ্জনের উপাদান পরিবেশন করে। এর মধ্যে আশ্রয় পায় জনপ্রিয় সংস্কৃতির উপাদান। হিন্দি গান, ফিল্মের নায়কদের অনুকরণে বাঁদরের কীর্তিকলাপ। এই সবের সঙ্গে দৈনন্দিন কাজকর্ম, বাজার করা, মাতলামি, সংসারের অনটন - সবমিলিয়ে জীবন নাট্যের নানা উপাদান ঠাসা - এক হিসেবে dramatization of life, ধর্ম এখানে কোন প্রভাবক নয়। মিথের গভীর টানও এই অভিকরণকে প্রভাবিত করে না। পারফরমার এখানে পারফরমার - কেষ্ট মেয়ের নাম হয় কিনা; একজন মুসলিম তার বাঁদরের নাম রেখেছে কেষ্ট - এসব ভাবার কোন অবকাশ নেই। পারসোনাল আইডেনটিটি আর পারফরমার আইডেনটিটি এখানে বিচ্ছিন্ন সত্তা। উভয়ের মধ্যে কোন একরৈখিক সরল সম্পর্ক নেই। লোকবৃত্ত যখন নাগরিকবৃত্তে উঠে আসে, তখন নানা ধরণের বহুস্তরী ঘোরপ্যাঁচ সৃষ্টি হয়। এবং এখানেই বাঁদর খেলা বেঁচে থাকবে না থাকবে না বলা কঠিন হয়ে যায়।

পুজোয় ঠাকুর ফেলা

সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

কার্তিক পুজোর সময় ছেলে ছোকরারা মজা করার জন্য যাদের ছেলেপুলে হয়নি তাদের বাড়িতে বা হাড়কিপটে গোছের লোকের বাড়িতে ঠাকুর ফেলে আসে এটা আমরা জানি কিন্তু তাই বলে আস্ত একটা দুর্গা ঠাকুর ফেলা! হ্যাঁ এরকমটাই ঘটত ১৮২০ থেকে ১৮৪০ এর কোলকাতায়। রাজাউজীরদের রমরমা ততদিনে কমার দিকে, চল হয়েছে বারোয়ারী পুজোর আর সেই সঙ্গে ঠাকুর ফেলার। কুমোরটুলি থেকে গোটা একটা প্রতিমা অনিচ্ছুক সম্পন্ন গেরস্থ ঘরে বা কৃপণের বাড়ির দরজায় রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি রেখে আসা হত। ১৮৩৩ এর ১২ই অক্টোবর 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় এক পাঠক সমাজে এই কদর্য ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এক চিঠি লিখেছিলেন। সম্পাদকীয়তে তাঁর মতেরই প্রতিধ্বনি করে লেখা হয়েছিল 'বলপূর্বক পূজা নেওয়া নিন্দনীয়। যারা এমন করে তারা সব অশিষ্ট যবিষ্ট ভূয়িষ্ঠ দুষ্ট।' কিন্তু বাঙালি চিরকালই সরেস আর দু'মুখো জাতি। তাই ১৮৩৩ এরই ২রা নভেম্বর আর এক পত্রিকা 'সংবাদ চন্দ্রিকা' এই কুপ্রথাকে সমর্থন করে 'সম্পাদকীয়'র উচিৎ জবাব দেয়। লেখা হল আগের কালে সম্পন্ন গৃহস্থকে ডেকে হিন্দু রাজারা পুজো করতে বলতেন। 'কেহ প্রতিমা পাইয়া নিতান্ত রুষ্ট হইয়াছে এমত বলিতে পারিবেন না কিংবা সেই প্রতিমা বাটিতে ফেলিয়াছে বলিয়া যে বাটির কর্তা তাঁহার নামে নালিস করিয়াছে কিংবা কেহ প্রতিমা পূজা করিয়া একেবারে কাঙাল হইয়াছে এমত কখন শুনা যায় নাই। বরং বিদ্যাদানচ্ছলে যাহারা দেশের সর্বনাশ করিতেছে তাহারদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করুন যেজন্য হিন্দু লোক সর্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া অহরহ প্রার্থনা করিতেছে ..... বাটিতে প্রতিমা রাখিয়া গেলে তাহাতে যদি কাহার ক্ষতি বোধ হয় সে বড় ৫০-৬০ টাকার ক্ষতি হউক কিন্তু ইহকাল পরকালের ভাল হয়। মিসনরিরা যে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহকাল পরকাল একেবারে যায়।'

১৮২০ র মে সংখ্যায় ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া কাগজে লেখা হয়েছিল হুগলীর গুপ্তি পাড়ার বারো ইয়ারের জগদ্ধাত্রী পুজোর কথা। ১৮৩৯ এর আগষ্টে ক্যালকাটা কুরিয়ার কাগজ লিখেছিল যে বারোয়ারী পুজো বেশ দস্তুর হয়ে উঠেছে। মাত্র মাস তিনেক আগেই গোটা পাঁচ ছয় এরকম পুজো নিষ্পন্ন হয়েছে। শোভাবাজারের মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ির কাছে একটা নতুন বারোয়ারী চালু হতে চলেছে, চাঁদা উঠেছে ৪০০০ টাকা। চাঁদাওলাদের দাপটে ঘরে টেঁকা দায়। টাকার বেশিরভাগ অংশই খরচ হবে প্রতিমা, সাজসজ্জা, নাচে, গানে, তামাশায়। এই সময়ও ঠাকুর ফেলার চল অব্যাহত ছিল।

যে বাসা ভাঙল ঝড়ে

উত্তম পাল

কিছু একটা ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটছিল নন্দিতা তাই একটু অন্যমনস্ক। বসন্তের শেষ সময় গাছের শাখায় শাখায় ভরা আছে নতুন কচিপাতা। ফুল আর ফলের সমারোহ সবখানে। আকাশে ইতস্তত মেঘের আনাগোনা, এমনি কত বসন্তই পার হয়ে গেল তবু নন্দিতার শাখায় ফুল ফুটল কই?

শেষবসন্ত কত না কালবোশেখী এলো গেল কত কিছুই তো এলোমেলো হয়েগেল তবু তেমন কোন অঘটন ঘটল না নন্দিতার জীবনে। সে তো তার বান্ধবীর মুখে এমনি এক কালবোশেখীর গল্প শুনেছিল। ঝড়ের তান্ডবে পড়েছিল একটি মেয়ে বিস্তৃত কোন মাঠের মাঝে। চারদিক ধুলোয় আর খসে পড়া গাছের পাতায় অন্ধকার হয়ে যায় তারপর কী যে হল তার আর কিছু মনে পড়ে না। অবশেষে জ্ঞান ফিরে দেখে সে নির্বাক -- হসপিটালের বেডে শুয়ে আছে। চিকিৎসায় সুস্থ হলেও স্মৃতি হারিয়ে গেছে, সে বলতে পারল না তার পরিচয়। তার বাড়ি থেকে কোন খোঁজও হল না। অবশেষে যার সাহচর্যে সে জীবন ফিরে পেল, বাক ফিরে পেল, নিরুপায় হয়ে তার কাছেই থেকে যেতে হল সেও এক ঘটনার ঘটনা।

না তেমন কোন ঘটনাও ঘটেনি নন্দিতার জীবনে। এমনি নানান কথাই ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে নন্দিতা। সহসা পশ্চিম আকাশে একটা মেঘ উঠল। মূহুর্তেই চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। কী করবে এখন নন্দিতা? পায়ের বেগ বাড়িয়ে দিল। ঝড়ের বেগ যে তার চেয়েও বেশি, তবে কি তাকে ছুটতে হবে? ছুটেই বা যাবে কতদূর, এখনো যে অনেকটাই পথ বাকি আছে। সামনে একটা বটগাছ। বেশ বড়সড়, ওর গোড়ায় আশ্রয় নিলে কেমন হয়? কিন্তু যদি ঝড়ের দাপটে ওর ডাল ভেঙে পড়ে তাহলে কী হবে সে কথাই ভাবছে নন্দিতা। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে ধুলোবালিতে চোখ মুখ ভরে গেল। মুখে চোখে হাত চাপা দিয়ে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল।

একটু দাঁড়ানোর পর সে যখন বুঝল ঝড়ের দাপট কমেছে তখন হাত আলগা করে চোখ দুটো খোলার চেষ্টা করল। প্রথমটাতে আবছা অন্ধকার দেখলেও মুহুর্তেই সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পেল কিন্তু এ কী দেখছে সে? তার সামনেই রাস্তার ওপর একটা পাখির বাসা পড়ে আছে যে! পাশেই দুটো ডিম ভেঙে শেষ হয়ে গেছে। আচমকা আঘাত লাগার মত বুকটা ধড়াস করে উঠল। মুখে উচ্চারণ করল, আহারে বেচারা পৃথিবীর মুখ দেখার আগেই ডিম দুটো ভেঙে গেল। এখন এই মুহুর্তে ওদের মা টা কী করছে কে জানে। বেচারা নিশ্চয় খুঁজে বেড়াচ্ছে তার বাসা তার ডিম। হয়তো সেও আঘাত পেয়েছে অথবা কোথাও আটকা পড়েছিল। এসে যখন দেখবে তার বাসা নেই, তার ডিম নেই তখন সে কী ভাববে কী করবে কে জানে।

নন্দিতা ভাবতে থাকে এ কী অদৃষ্টের পরিহাস। আমার সামনেই এ বাসা কেন ভেঙে পড়ল তবে কী ..... না না সে কেন এসব ভাবছে, কত মেয়ের তো কত বেশী বয়সেও বিয়ে হয়েছে, সেও তো বাসা বেঁধেছে, হয়তো একটু দেরিতে। বাসাটা তো অন্য জায়গাতেও ভেঙে পড়তে পারত, একেবারে তার সামনেই পড়ল কেন? না, না সে সব কথা একদম ভাববে না। মনটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

কোন দিকেই বা নিয়ে যাবে। বারবার দেখাশোনা করেও যখন কোন জায়গাতেই স্থির করা যাচ্ছে না তখন পাড়ার লোকে বলাবলি করতে লাগল, 'মেয়েটার কী ভাঙা রাশ রে বাবা, যেখান থেকেই আসছে সেখানেই ভেঙে যাচ্ছে'। একথাগুলো নন্দিতার কানে এসেছিল। এই মুহুর্তে সেটাও মনে পড়ে যাচ্ছে। হায় অদৃষ্ট ভাগ্যে কী আছে কে জানে।

কিছুক্ষণ পর একটা পাখি নন্দিতার সামনে দিয়ে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে এলো। এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে পড়ে থাকা বাসাটা দেখতে পেল। আরও জোরে চিৎকার করে সেখানে গিয়ে বসল। আশপাশ দেখে নিয়ে বাসার পাশে রাস্তার ওপরে মুখ ঠুকতে লাগল।

সত্যিই তো কত কষ্ট করে তৈরী করা বাসা শুধু কি তাই? তার সাধ্য তার সন্তানের প্রাণ। হয়তো এটাই তার প্রথম সন্তান হতে পারত। এভাবে পাখিদের কাঁদতে নন্দিতা কোনদিন দেখেনি। নন্দিতা পাখিদের ভাষা বোঝেনা তবু তার ভাব দেখলে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে সে শোকে কাতর। নন্দিতাই বা কী করবে। কিছু বুঝতে না পেরে মনে মনে বলল 'আহারে বেচারার কত না দুঃখ'।

পুব আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ডিমের কুসুমের মত রঙ নিয়ে ক্রমে উপরে উঠছে। একটি বিস্তৃত বালিচড়ায় ঝোপ ঝোপ কাশ গাছের পাশাপাশি বসে আছে রাজেশ। সেই ম্লান গোধুলীবেলা থেকেই আছে সুদূর নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে। যেন সমুদ্রের অগাধ জলরাশি অথচ ঢেউ নেই, নেই কোন কোলাহল। নিজের শরীরটা যে ঐ বিগতশ্রী কাশগুচ্ছের মত হয়ে গেছে কে ভাবে সে কথা, এ যে হেমন্তের বেলা বোধ হয় সে কথা ভুলেছে বলে। পার্থিব এই সব প্রাকৃতিক ভাবনাগুলো তার আর ভাবতে ভালো লাগে না। সেদিন থেকেই সে ভুলে থাকতে চেয়েছে যেদিন নন্দিতা সামান্য একটু কথার জন্য চরম আঘাতটা

দিয়ে বসল।

নন্দিতাকে মনের গহন থেকে সরিয়ে রাখতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। রাজেশ উদাসীনের মত ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছে। প্রকৃতির রূপের নিত্য ওঠানামা ভাবের দিকে তাকিয়ে রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করেছে। অথচ নতুন করে অন্য কোন নন্দিনীর কথা ভাবতেও পারেনি।

না, নন্দিতাকে রাজেশ আর মনে করবে না ঠিক তেমনি ভাবে নন্দিতার আসনে আর কাউকে বসাবেও না। আপন মনে রাজেশের আপন সিদ্ধান্ত। নন্দিতা সিদ্ধান্ত বদল করবে কি না ভাবছে। সেদিন সেই ঝড়ের দিনটার পর থেকে আর তো কোন যোগাযোগও হচ্ছে না। কোনো জায়গা থেকেই আর দেখতেও আসছে না। সে জন্যই যখন একা একা নির্জনে থাকে তখন মনে পড়ে সেই দুর্ঘটনার কথা, নন্দিতার অদৃষ্টেও কি এই ভাঙা বাসাই আছে যে তার আর ঘর বাঁধা হবে না? সামান্য একটু ভুলের জন্য তাকে আজ অঙুল কামড়াতে হচ্ছে। রাজেশ প্রত্যাখ্যান করেনি শুধু ক'টা দিন সময় চেয়েছিল। সব দোষ স্বীকার করে আজ যদি নন্দিতা রাজেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে তবে কি রাজেশ আজও ফিরিয়ে দেবে?

সরাসরি মুখোমুখি না হয়ে রাজেশের নম্বরে কল করল। সেখান থেকে একটাই উত্তর এলো, 'এনম্বরের বাস্তব অস্তিত্ব নেই'। বার বার একই কথা আসায় অবশেষে সাক্ষাতের সিদ্ধান্তই নিল সে। কিন্তু কোথায় রাজেশ? খোঁজ নিয়ে যখন পাত্তা হল না তখন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তারই মত একজনকে দেখতে পেয়ে নন্দিতা থমকে দাঁড়াল খানিক। চিনতে খুবই কষ্ট হচ্ছে নন্দিতার তবু কোথায় যেন মিল আছে ভেবে আবেগে আপ্লুত নন্দিতা দ্রুত বেগে পা চালিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'আমি নন্দিতা, আমাকে চিনতে পারছ না রাজেশ'। কোন উত্তর নেই। আবারো জোর দিয়ে বলল, 'রাজেশ, আমি নন্দিতা,' কোন রকম চঞ্চলতা নেই রাজেশের মধ্যে শুধু বলল, 'কে নন্দিতা, আমি তো চিনলাম না'। পরক্ষণেই পাগলের মত হাসতে হাসতে এগিয়ে চলল। নন্দিতা স্থির নিশ্চল।

রক্তবীজের বংশ

অমিতকুমার রায়

প্রশ্ন হল - আমরা কি সচেতন? তারও আগে প্রশ্ন, আমি কি সচেতন? আরও প্রশ্ন, সব কাজ কি প্রশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব?

এই প্রশ্ন কার জন্য জানেন? রক্তবীজের বংশধরের ন্যায় বর্ধমান পার্থেনিয়াম নামক এক গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ যার বিষাক্ত বীজ মার্কিন মুলুক থেকে বস্তাভর্তি গমের মধ্যে দিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছে।

আজ হাওড়া জেলার জাতীয় সড়ক, প্রত্যন্ত গ্রামের রাস্তার ধারে (আমার পাশের গ্রাম পাইকবাসার রাস্তার দু'ধারে, অমরাগড়ীর কিছু অংশে), অল্প জলাজমিতে এর অবাধ বিচরণ। গাছগুলির ফুল ফুটলে ছোট ছোট সাদা হাসির হাট বসে ঠিকই কিন্তু তা যে কতটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়াবহ তা মানুষ জেনেও নির্বিকার।

এই ফুলের রেণু হাঁপানি রোগের সৃষ্টি করে এবং চামড়ার ক্ষতি করে। একে ধ্বংস করার একটাই উপায়, গাছে ফুল আসার আগেই উপড়ে ফেলে গাছগুলিকে পুড়িয়ে ফেলা। কে করবে? কার সময় আছে? প্রত্যেক মানুষকে নিজের এলাকায় সতর্ক থাকতে হবে, গাছ দেখলেই উপড়ে একজায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলুন - এতে আপনি রক্ষা পাবেন এবং অপরকেও রক্ষা করবেন।

রক্তবীজের বংশ দনুজদলনী যেন ধ্বংস করে বলে ঢাকের তালে ভুলে গেলে চলবে না।

স্বপ্নে বাঁচা

চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র

আপনি আমাকে স্বপ্ন দেখতে নিষেধ করতেন
কোন সময় স্বপ্নে নাকি সর্বনাশ
আপনার চোখ দুটো লাল ভিতরে আগুন
আরো ভিতরে কি ছিল জানিনা
আমি আপনার তামাক সেজে দিতাম
আপনি আমাকে ভালবাসতেন আমার পেট সবসময় ভরা
নির্বোধ সরল বালক যদি বিপদে পড়ে যাই
ভাবনার শেষ ছিলনা আপনি উপযুক্ত অভিভাবক
আমি কোন দিন চোখের জল ঝরাইনি
দুঃখ ছিলনা তো, ব্যথাও নয়
সময় কেমন বলে দেয় গাছের পরিচয়
সময়ের সিঁড়ি ভাঙা আপনার অভ্যাস নেই
দিন বদল ঝরে পড়ল সব পালক যেমন ঝরা পাতা
হায়না শরীর জড়ানো দিন হরিণের চামড়া
আপনি কি হিংস্র পাপের বোঝা পেলে দিতে ভীষণ ব্যস্ত
চোখের মধ্যে যে আগুন সবটাই রক্ত পিপাসা
নখগুলো ধারালো মাংস ছেঁড়া দাগ
আমার বুক থেকেও ছিঁড়ে নিলেন এক খাবলা মাংস
ছুটে পালাবো পায়ে শক্ত শিকল, আগে বুঝতে পারিনি
আমার বোকা ভাবটায় ছুটে এসেছে কালবৈশাখী ঝড়
বজ্র বিদ্যুৎ তামাকের মত আমার হাতে
অনেক আগুন, আমার স্বপ্নে আমার চিতা
আগামী পৃথিবীতে নিরীহ মানুষের নিরাপদ বিচরণ
আমি যন্ত্রণার শরশয্যায় সূর্যের হাত ধরেছি।

রটনা নয় ঘটনা

কাজল সেন

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সালটা হবে বোধ হয় ১৯৭৭। আমি তখন 'সত্যযুগ' পত্রিকার সাংবাদিক। প্রতিদিনের মত দুপুরে অফিসে গেছি। আমায় দেখা মাত্র চীফ রিপোর্টার ডেকে বললেন কাল বাঁকুড়ায় একটা প্রেস কনফারেন্স আছে বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে। আপনি যাবেন। কাল সকাল দশটায়। তাই আজই রাতে আপনাকে যেতে হবে।

আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি অভয় দিয়ে বললেন প্রেস কনফারেন্স হয়ে গেলে টেলিফোনে সংবাদটি দিয়ে দেবেন। আর একদিন ওখানে থেকে বাঁকুড়ার খরা প্রসঙ্গে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে একটা 'স্টোরি' জমা দেবেন। যান ক্যাশ অফিস থেকে টাকা নিয়ে নিন। আমি এ্যাডভান্স টাকা নিয়ে বাড়ী চলে এলাম। কারণ রাত্রে ট্রেন।

বাড়ী থেকে রাত্রে হাওড়া স্টেশনে এলাম। দেখলাম বাঁকুড়া যাবার ট্রেন রাত ১১টা নাগাদ 'আদ্রা পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জার'।

ট্রেন ছাড়তে দেরী আছে দেখে স্টেশনে 'হুইলার'-এর দোকানে ম্যাগাজিন দেখছি। হঠাৎ উচ্চকণ্ঠের মহিলার আওয়াজ কানে বাঁধল। তাকিয়ে দেখি ঐ দোকানের এক প্রান্তে বিশালদেহী এক মহিলা চিৎকার করে বলছেন - আপনি কি আমার সাথে ইয়ারকি করছেন? আমি ঐ বই চেয়েছি।

পুস্তকবিক্রেতা অনুনয় বিনয় করে বলছে - সরি, ম্যাডাম আমি ইয়ার্কি করছি না। 'কি করে ওজন কমাতে হয়' বইটা নেই। তবে সত্যিই 'কি করে ওজন বাড়াতে হয়' বইটি আছে। এই দেখুন বলে বইটি তুলে দেখাল।

বিশালদেহী মহিলা কটমট করে পুস্তকবিক্রেতার দিকে তাকিয়ে আছে।

পুস্তকবিক্রেতা সবিনয়ে বলল, আপনি ওজন কমাবার বই চেয়েছেন। তার বদলে ওজন বাড়াবার বইটি -- নিয়ে পড়ুন যা লেখা আছে তার উল্টো করবেন। সোজা পদ্ধতি। ব্যস্।

রেগে কাঁই হয়ে বিশালদেহী মহিলাটি বিড়বিড় করতে করতে চলে গেলেন। আমিও ট্রেনে ওঠার জন্য পা বাড়ালাম।

ট্রেনে উঠে রির্জাভেসন কামরায় নিজের বাঙ্কের সীটটিতে চাদর পেতে গা এলিয়ে দিয়েছি। ট্রেন চলতে শুরু করল, গতিও বাড়ছে। আমার সীটের অপর প্রান্তের সীটে দুই বন্ধু বসে গল্প করছেন আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন।

একজন পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন - চলবে?

আমি বললাম - নো থ্যাঙ্কস্।

সে সময় ট্রেনে সিগারেট বা ড্রিঙ্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিলনা।

কিছুক্ষণ পর অপর ব্যক্তি আমাকে ডেকে বোতল দেখিয়ে বলল - ড্রিঙ্কস চলবে?

আমি সবিনয়ে জানালাম -- না।

কিছু পরে আবার দু'জনই বললেন - নামুন না তাস খেলি। ফিস বা ফ্লাস। দু'জনের হাতে ড্রিঙ্কস।

বললাম -- না।

তাঁরা বলে উঠলেন -- আপনি কি খড় খান?

আমি বললাম -- আজ্ঞে নিশ্চয় নয়!

একজন বললেন -- প্রীত হলাম।

অপরজন বললেন -- দেখা যাচ্ছে আপনি মানুষ অথবা জন্তু কারোরই উপযুক্ত সঙ্গী নন।

আমি মুচ্‌কি হেসে বললাম -- ঠিক বলেছেন, আই এম নট্ এ ম্যান, নট এ বীস্ট।

এরপর ঐ দু'জন আর কোন কথা না বলে নিজ কাজে ব্যস্ত রইলেন। আমি বাঙ্কে ঘুমোতে লাগালাম। কারণ ভোরে আমায় নামতে হবে বাঁকুড়ায়। গাড়ীর ঝাঁকুনীতে ভোর চারটে নাগাদ যথারীতি ঘুম ভেঙ্গে গেল। ট্রেন বাঁকুড়ায় থামবে। তলপীতলপা গুছিয়ে আমিও তৈরি হলাম।

বাঁকুড়া স্টেশনে নেমে সিঁড়ি দিয়ে রেলব্রীজ-এ উঠব এমন সময় সিঁড়ির মুখে টিকিট কালেক্টরের সাথে এক পরিবারের বচসা শুরু হয়েছে। আমি একটু দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগলাম। টিকিট কালেক্টর ঐ পরিবারের হাত থেকে টিকিটগুলো নিয়ে টিকিটের সংখ্যা ও পরিবারের সংখ্যা মিলিয়ে দেখছেন। এই পরিবারে ছিল দু'জন পুরুষ, একজন মহিলা আর তিনটি সমবয়সী বাচ্চা।

টিকিট কালেক্টর বলছেন - আপনারা ছ'জন আর টিকিট চারটে?

যাত্রীপরিবারের প্রধান বললেন - ঠিকই দিয়েছি, হিসাব মিলিয়ে দেখুন ঠিকই আছে।

টিকিট কালেক্টর - চারটে প্রাপ্ত বয়স্কের টিকিট তিনটে, বাচ্চার টিকিট কোথায়?

যাত্রী পরিবার -- আমরা তিনজন পূর্ণ বয়স্কের তিনটি, আর তিন বাচ্চার জন্য একটি প্রাপ্ত বয়স্কের টিকিট।

টিকিট কালেক্টর -- আপনার হিসাব অনুযায়ী ধরলে দু'টি বাচ্চার জন্য একটি পূর্ণ বয়স্কের টিকিট। আর একজন বাচ্চার টিকিট কই?

যাত্রী পরিবার -- ওদের তিনজনের বয়স পাঁচ। একই মা। একদিনেই জন্ম। তাই একটা পূর্ণ বয়স্কের টিকিট।

ওদের কথা শুনে আমি হেসে উঠলাম। টিকিট কালেক্টরও হেসে ফেলল। আমার টিকিটটি কালেক্টরের হাতে দিয়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গন্তব্যস্থানে গেলাম।

একটুখানি শান্তি

প্রণব কুমার দাস

ঝড়, প্রলয়, ভূমিকম্প!
হঠাৎ
আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে, সমগ্র পৃথিবীকে টলিয়ে দিয়ে, ঘন মেঘের ভিতর থেকে আবির্ভূত হলেন,
শুভ্র বসন পরিহিত এক মহাপুরুষ
হাতে তার শান্তির প্রদীপ, মুখে তার হাসির রেখা।
থমকে গেলো -
হাসি মিলিয়ে গিয়ে মুখ হল শুষ্ক-পাংশু
কেন?
উত্তরে বিচ্ছিন্নতা, দক্ষিণে বর্ণবিদ্বেষ, পূর্বে ক্ষমতা গ্রাসের লড়াই, পশ্চিমে পরমাণুশক্তির আস্ফালন, ঈশানে কান্না, অগ্নিতে হাহাকার নৈঋতে শোষণ, বায়ুতে বঞ্চনা, উর্দ্ধে মহাকাশযুদ্ধ, নীচে সাবমেরিনের জারিজুরি।
ক্ষণেক চিন্তা --
''তবে কি পৃথিবীতে এসে ভুল করলাম?''
অনেক আশা নিয়ে শান্তির প্রদীপ জ্বালাতে এই আবির্ভাব,
কিন্তু হায় --
দাঁড়াবার মতো ঠাঁই নেই।
আবার চিন্তা
''আমি কি আলাদিন? এক নিমেষে সমগ্র পৃথিবীটাকে করে দেবো এক শান্তির সরাইখানা। কিংবা, আছে কি সেই ক্ষমতা - এই অশান্ত পৃথিবীকে মুহূর্তে- ধ্বংস করে, নূতন করে প্রাণীর - আদম-ঈভের জন্ম দেবো''
সম্ভব নয় -
শেষে সিদ্ধান্ত ফিরে যাওয়ার।
ফিরে যাওয়ার আগে পৃথিবীর বুকে নেমে এলো এক মূল্যবান ঘোষণা - ''ভাইসব, আমি এসেছিলাম তোমাদের সুস্থ করে এক শান্তির পৃথিবী স্থাপন করতে। এই অশান্তির মাঝে আমি দিগভ্রান্ত। তোমরা জাগো। তোমাদের দিব্যচক্ষু উদয় হোক। গর্জে ওঠো - শোষণের বিরুদ্ধে, শাসনের বিরুদ্ধে। শ্লোগান হোক - শোষণ নয় সাম্য চাই, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, হিংসা নয় ভালোবাসা চাই, দাসত্ব নয় স্বাধীনতা চাই।''
আবার --
ঝড়, প্রলয়, ভূমিকম্প!

স্বাধীনতার পর আমরা

অভিজিৎ হাজরা

স্বাধীনতার পর
আমরা পেরিয়ে এসেছি ৬৪টা বছর।
ইংরেজ চলে গেছে অনেকদিন
কিন্তু বিকৃত ইংরেজীয়ানা যায়নি এখনও
ইংরেজী এখন আমাদের মাতৃভাষা
ড্যাড্ডি-মাম্মি, হাই-হ্যালো আমাদের চলতি বুলি
নাইট ক্লাব আর রিসর্ট আমাদের সংস্কৃতি।
শিশু পায় না মায়ের কোল
ঠাকুমার রূপকথা
শৈশবের এক আকাশ কল্পনা
আর মেঠো মাঠের দুরন্ত অবকাশ,
কোথায় হারালো সে সব .....?
দোহাই আপনাদের - কোন প্রশ্ন করবেন না
রাগ করবেন না
ঘৃণা করবেন না
কারণ স্বাধীনতার পর
আমরা পেরিয়ে এসেছি ৬৪টা বছর।

সাম্প্রদায়িকতার বুলেট
আর সন্ত্রাসের তীক্ষ্ণ ফলায়
আজ ক্ষতবিক্ষত অগণিত মানুষের বুক
ধমনী-ফাটা গরম টকটকে রক্তস্রোতকে
আলাদা করে চেনা যায় না।
কোনটা হিন্দু-কোনটা মুসলমান
সব রক্তই যে লাল
সব মৃত্যুই যে নীল
এদের রঙ কি কখনও বদলায় .....?
দোহাই আপনাদের - কোন প্রশ্ন করবেন না
ঘৃণা করবেন না
কারণ স্বাধীনতার পর
আমরা পেরিয়ে এসেছি ৬৪টা বছর।

ছড়ায় মোড়া প্রবাদমালা

মালতী দাস

- *কথা কম যার কাজটা বেশি*
  দামটা তারই হোক বিদেশী
- *চোখ থাকতে অন্ধ হলে*
  ব্যাপার জেনো গোলমেলে
- *এক ঢিলে দুই পাখি মারা*
  এ কাজ কি হয় ধূর্ত ছাড়া
- *উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে*
  চতুর হলেই এ কাজ পারে
- *ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে*
  আট পেরিয়েই আশি আসে
- *সাবধানের নেইকো মার*
  জেনে রেখো এটাই সার
- *দশের লাঠি একের বোঝা*
  প্রথমটিতেই বাঁচা সোজা
- *তিলকে করা তাল*
  থাকবে চিরকাল
- *ধরি মাছ না ছুঁই পানি*
  ধান্দাবাজের এটাই বাণী
- *ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া*
  বিবেকবানের বিবেক যাওয়া
- *ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি*
  কে চায় ভিজে আনতে হাঁচি
- *ঝোপ বুঝে কোপ মারা*
  উপায় নেইকো এটি ছাড়া
- *গৌরী সেনের টাকা*
  নয় তো সহজ রাখা
- *কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে*
  নয়কো সহজ নেওয়া ঘিঁটে
- *চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে*
  সে বুদ্ধি লাগে কি দরকারে
- *হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা*
  বিকল্পহীন অবহেলা
- *ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো*
  মারতে ইঁদুর যেমন হুলো
- *কই মাছের প্রাণ*
  রাখলে পরেই মান
- *স্যাকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা*
  যত আছে আত্মীয় একশই একা মা
- *বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি*
  খুঁজলে পরে এমন মানুষ মিলবে বারমাসই
- *নুন আনতে পান্তা ফুরোয়*
  চেষ্টা থাকলেই শিখরচূড়োয়
- *গভীর জলের মাছ*
  সবার আগে বাছ
- *রাখে হরি মারে কে*
  বিজ্ঞ হলেই বুঝবে সে
- *সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে*
  সহজভাবে নিও মেনে
- *সাতে পাঁচে না থাকা*
  জীবন যাবে বাঁচিয়ে রাখা
- *গরীবের ঘোড়া রোগ*
  ক্ষণিকের সুখ ভোগ
- *ধান ভানতে শিবের গীত*
  মৃতের আবার গরম শীত
- *উড়ে এসে জুড়ে বসা*
  রাখা কঠিন মানের দশা
- *হালে পানি পাওয়া*
  আহা যেন দখিন হাওয়া
- *ধনুক ভাঙা পণ*
  ভাল কাজের ধন
- *ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া*
  নয়কো এটা যুগের হাওয়া
- *আঙুল ফুলে কলাগাছ*
  পতন ঘটার আছে আঁচ
- *গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল*
  মিটলে আশা খতম খেল

Mr. Avijit Chakraborty
Tax Consultant
(Member, Merchants' Chamber of Commerce)

ASSOCIATED CONSULTANTS

Contact us for : All types of Taxation Matter, Licence, Registration, Deeds -N-Documents, Project Report for Bank Finance & Fully Computerized Accounts.
Land Mark : Kamardanga Mini Bus Stand
or S.E.Rly.Crossing
Near - Saraswati Bhavan
Cell - +91-9836278083
& Office - +91-33-6548-6752
E-mail : associated_tax@yahoo.in

জয় হোক কন্যাকুমারীকা

বিনয়শংকর চক্রবর্ত্তী

কন্যাকুমারীকা স্বামী বিবেকানন্দর সাধনা পীঠধাম। সর্বজন স্বীকৃত। এই কন্যাকুমারীকা চেন্নাই (মাদ্রাজ) শহরে দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত। কন্যাকুমারীকা কেন নামকরণ হল? চারিদিকে সমুদ্রের অথৈ জলের মাঝখানে একটি দ্বীপের মতো অবস্থানে কি করে স্বামীজী উপস্থিত হলেন? আর কেমন ক'রেই বা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন? এখন সেই আলোচনাই মুখ্য বিষয়।

সাধুর নাম অনাথবন্ধু রায়। হৃষিকেশের 'শিবালয়' যাঁর আশ্রম। তাঁর মুখ থেকে যে সব ঘটনা জানতে পারা যায় -- তাই এখন উল্লেখ করা গেল।

প্রথমেই বলি 'কন্যাকুমারীকা' নামের সার্থকতা কি? সে এক বিরাট ইতিহাস। পরমেশ্বর শিবের সহধর্মিনী পার্বতীর লীলাখেলা। একবার হয়েছে কি মনে -- পার্বতীর ইচ্ছা জাগে তখন কুমারী অবস্থায় -- সাধ হয়েছে তিনি বিয়ে করবেন। আর সেই বিয়ে হবে কার সঙ্গে না -- 'পরমেশ্বর শিবের' সাথে। কিন্তু নারদের পাল্লায় শিবকে প্ররোচিত হতে হয়। পরে আর পার্বতীর বিবাহ হয় নি। ঐ কুমারী অবস্থায় এই দ্বীপের শূণ্য প্রান্তরে একাকী বাস করেন। নাম হয় 'কন্যাকুমারীকা'। পার্বতীর পাদুকার ছাপ আজও বর্তমান - এটাই জনশ্রুতি আছে। যাক্ সে কথা। এবার আসি স্বামীজী কেমন করে সমুদ্রের সৈকত ভূমি থেকে ১৫০/১৬০ কিমি পথ সাঁতার কেটে ঝাঁপিয়ে 'কন্যাকুমারীকায়' উপস্থিত হলেন সেই রহস্যের খোঁজে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায় - ''তুই সপ্তঋষির একজন ঋষি। দেশ-বিদেশে তুই কত বিবেকের বাণী ছড়াবি''- সেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য স্বামীজী দেশ-বিদেশে ঘুরছেন। ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণভারতে উপস্থিত হন।

সম্মুখে দেখেন সমুদ্রের চারিদিকে জল আর জল। তারি মাঝখানে বর্তমান 'কুমারীকা'।

স্বামীজীর তা দেখে কৌতুহল জাগে -- এই স্থানই হচ্ছে 'সাধনাগার'। নির্জন নিরালা স্থান। জনমানবশূণ্য। মনে ভাবনা জাগামাত্র অমনি ঐ স্থানে সাধনার সঙ্কল্প ক'রে নেন। কিন্তু মনে বাসনা জাগলে কি হবে? কি করে ১৫০/১৬০ কিমি পথ বিপদসঙ্কুল জল যেখানে আবার কুমীর, জলজন্তুর বাস তা পার হওয়া যাবে। পথিমধ্যে দেখা হল কিছু সংখ্যক জেলেদের সাথে। নৌকা নিয়ে মাছ ধরে। স্বামীজী মনের কৌতুহল জানালেন। কিন্তু তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করলেন না। স্বামীজীর 'তীব্র ব্যাকুলতা' - যেভাবেই হোক তাঁকে ওখানে পৌঁছাতে হবেই হবে। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ আনচান করছেন। ইত্যবসরে ঠাকুরকে স্মরণ করলেন আর মনে মনে 'ইষ্ট-মন্ত্র' জপ করে চলেছেন।

অকস্মাৎ যেন তিনি দেখতে পেলেন 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন'। যেই দেখা অমনি জলে ঝাঁপ দেওয়া।

পরে সাঁতার কাটতে কাটতে কিভাবে কন্যা-কুমারীকায় গন্তব্য স্থানে পৌঁছলেন - তা সত্যিই বিস্ময়। পৌঁছলেন বটে, কিন্তু নিরালা - নির্জন পাথরের উপর কারো হদিশ পেলেন না। শুধু পাহাড় - পাহাড়। চারিদিকে জল। আর পাহাড়ের এক জায়গায় দুটি পায়ের ছাপ লক্ষ্য করলেন। কৌতুহল জাগলো কোথা থেকে পায়ের ছাপ এলো। নিরালা নির্জন স্থান, পরে তিনি ধ্যানে মগ্ন হন। স্বপ্নাদেশ হয় - 'তুই সাধনা করে যা জগৎমাতার। আমার মাহাত্ম্য প্রচার করে যা'।

এসবই জেলেদের কাছ থেকে শোনা। সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। এ শক্তি যে কি যার উপর নির্ভর করে সেও জানে না, আর যার উপর নির্ভর করে না সেও জানে না। এসবই ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ। মানলে আস্তিক, না মানলে নাস্তিক। জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ। জয়তু বিবেকানন্দ। জয় হোক কন্যাকুমারীকা পীঠধাম।

M/S Techno Fabricating Concern.

Shanpur Baghwan Das Math, P.O.- Dasnagar, Howrah-711105

Manufacturing of Impeller, Ducting, Casing, Chassis, Floor Plate, Gear Box etc.

Contract with : Radha Raman Hazra & Kamalesh Kumar Manna

Ph. - (033) 2667-6926

অন্য শ্বশুরবাড়ী

অনিতা সেনগুপ্ত

হাওড়ার ভবানীপুর গ্রাম, একটি বাড়ীর দাওয়ায় বসে কৃপণ ক্যাবল। মাথায় হাত দিয়ে ভাবছিল - তার বাপের আমলের গামছাটা কি করে হারিয়ে গেল!

দূরের মাঠের দিকে তার চোখ পড়তেই দেখতে পেল যে, একটা বাছুর জাবর কাটছে। সে ভাবল - বাছুরটাই গামছাটা খেয়ে ফেলেছে। গামছাটা সে কিনেছিল তার বাবার মৃত্যুর আগে।

ক্যাবলাই ছিল একমাত্র বংশধর। কৃপণ বলে খরচের ভয়ে সে বিয়ে করেনি। তাই পড়শীরা মনে করে কৃপণ ক্যাবলার মুখ দেখলে হাঁড়ি ফাটে।

বাছুরটাকে জাপটে ধরে তার পেট থেকে সে গামছাখানা বের করবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর গলা ও পেট অনেক টেপাটেপি করেও বাছুরটার মুখ থেকে কিছুই বের করতে পারলনা শুধু বাছুরটা 'হাম্বা'-'হাম্বা' করে উঠল। রাগে তার কান মলে দিল। এই অবস্থায় ক্যাবলা বুঝল যে এই বাছুরটাই গামছাটা খেয়ে ফেলেছে। সে তখন মনের দুঃখে বসে পড়ল।

গামছার শোকে আর টাকা খরচের ভয়ে মনে মনে ঠিক করল যে সে আর চুল, দাড়ি কামাবেনা। কিন্তু গামছার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারল না। দীর্ঘ কয়েক বছর বাদে সে ভাবল যে শহরে গিয়ে সস্তায় একটা গামছা কিনে আনবে।

একদিন সে শহরের পথে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে দেখল একজন অতি কৃপণ লোক পুকুরের পাড়ে বসে একটি কঞ্চির ডগায় সরু সুতো দিয়ে বাঁধা একখানা জিলিপি হাতে নিয়ে জলের উপর ঝোলাচ্ছে। তারপর জিলিপির ছায়ায় পড়া জল লোকটি হাপুস নয়নে খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে কৃপণ ক্যাবলার লোকটির প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল, তাঁকে গুরুদেব বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

তারপর আবার সে শহরের পথের দিকে এগোল। শহরে এসে ট্রাম, বাস, গাড়ী, ঘোড়া এবং সাজানো দোকানপাট দেখে সে হক্‌চকিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা কম পয়সার গামছা মিলল। হঠাৎ সে চোর চোর বলে সোরগোল শুনতে পেল। ঘাবড়ে গিয়ে কৃপণ ক্যাবলা ছুটতে শুরু করল। শেষে ধরা পড়ল এক পুলিশের হাতে। পুলিশ তাকে চোর বলে হাজতে পুরে দিল। অনেক কাকুতি মিনতি করা সত্ত্বেও তাকে না ছেড়ে আদালতে হাজির করা হল। আদালতের রায়ে তার একবছরের জেল হয়ে গেল। ক্যাবলা একবছর বাদে জেল থেকে মুক্তি পেল। জেল খেটে সে কিছু টাকাও পেয়েছিল। ঐ টাকা থেকে কিছু নিয়ে সস্তার একটা গামছা কিনে সে গ্রামের উদ্দ্যেশে রওনা হল। .....

তার শরীর মোটা, চুল দাড়ি কামানো, পরিষ্কার ধুতি পরা দেখে গ্রামের লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল -- এতদিন সে কোথায় ছিল? তখন ক্যাবলা পরিহাসছলে বলল 'শ্বশুরবাড়ী'! গ্রামবাসীরা এই কথায় আরও অবাক হয়ে প্রশ্ন করল --'বৌ কোথায়?' কৃপণ ক্যাবলা বলল -- 'এই শ্বশুরবাড়ীতে বৌ থাকে না। কিছুতেই শালারা ছাড়েনা। একটু খাটতে হত যা, নইলে খুবই আরামে ছিলাম।' তার কথা শুনে পড়শিরা একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

নিমাই মান্নার দু'টি কবিতা

১

বাইশে শ্রাবণ

বাইশে শ্রাবণ - চিহ্ন
নেইই কোথা কিছু!
পঁচিশেরই পদ্ম ফোটে
জীবনেরই নিত্য পিছু পিছু!!

২

কিছু স্মৃতি - কিছু কথা

কিছু স্মৃতি নিয়ে ফিরি
নিরন্তরই অন্দরে - দুয়ারে!
কিছু কথা নিয়ে থাকি
এক্কেবারেই ঘরেরই বাহিরে!!

জাতের নামে বজ্জাতি

পিয়ালী কুমার

জন্ম তোমার সহস্র বছর আগে,
তবু আজও তুমি চিরনবীন।
তোমার জন্মের নেই কোন নিশ্চিত তিথি
তবু তুমি জন্মেছ তিল তিল করে।
বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে,
তোমায় ধ্বংস করতে।
তবুও তোমায় গ্রাস করেনি কোন জ্বরা,
বরং তুমি লাভ করেছো নবযৌবন।
আজ তুমি পৌঁছেছ যৌবনের স্বর্ণশিখরে,
যৌবনের মত্ততায় গ্রাস করেছ মনুষত্বকে।
তোমাকে পুঁজি করে প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে,
বহু জনপদ, কত পুরানো স্থাপত্য।
তুমি আর কেউ নও,
চির পরিচিত 'জাতধর্ম'
অনেক তো হল রণমত্ততায় পুরাতনের ধ্বংস,
এবার কি নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায় না?
যদি তুমি নাই বা পার ---
নতুন কিছু সৃষ্টি করতে,
তবে তোমার রণমত্ততায় ধ্বংস করো
এ মহা ধরণীকে।
এই হোক তব শুভ উদ্যম।

যা দেবী সর্বভূতেষু

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

পুজো এলো, দুর্গা মাগো, সবার মুখেই ফুটুক হাসি
পুজো এলো, সবাই সাজুক, সবার বুকেই বাজুক বাঁশি।
সবাই আসুক, সবাই হাসুক, ভাসুক ভালোবাসার ভেলায়
দুঃখ ভুলে, পরাণ খুলে, মাতুক সবাই খুশির খেলায়।
জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাক সবার বুকের দুখের চিতা,
"যা দেবী সর্বভূতেষু মুক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ",
অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতম, অন্তরতম!

পুজো এলো, সব শিশুরাই উড়ুক খুশির পাখনা মেলে
বই-খাতা সব শিকেয় তোলা, ঘুরুক সবাই হেসে-খেলে।
সবাই যেন পূর্ণতা পায়, সবাই যেন দুঃখ ভোলে
ঢ্যাম-কুড়াকুড়, ঢাকের বোলে, সবার যেন হৃদয় দোলে।
"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ",
অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতম, অন্তরতম!

অসুর নিধন হয়নি আজও, লক্ষ অসুর জগৎ জুড়ে
বুক ফুলিয়ে, মুখ দুলিয়ে, বীরের মতই বেড়ায় ঘুরে।
দুষ্ট দমন করিস যদিই, পুষ্ট কেন হয় ওরা সব
দশ-হাতে দশ অস্ত্র নিয়েও আর কতকাল থাকবি নীরব?
তবে কি সব মিথ্যে মাগো উপনিষদ-পুরাণ-গীতা?
"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ",
অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতম, অন্তরতম!

এখনও তোর হয়নি বোধন, এখনও দেশ হয়নি শোধন
একদিকে তাই দুঃখ-রোদন, অন্যদিকে নাচন-কোঁদন।
বৃথাই বড়াই, দাঙ্গা-লড়াই, নিঃস্ব বিশ্ব ব্যথায় ভরা
লোভ-ক্ষোভ-খেদ, হিংসা-বিভেদ, জিঘাংসা-জেদ গা-হিম করা।
এমন দিনে আয় মাগো তুই অপরূপা অপরাজিতা,
"যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ",
অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতম, অন্তরতম!

কৈলাসে কেলেঙ্কারি

অনিতা ঘোষ

কৈলাসেতে কেলেঙ্কারি হয়েছে লঙ্কা কান্ড।
বৈকুণ্ঠে নারায়ণের হয়েছে নিদ্রা ভঙ্গ।
নারদকে ডেকে বললেন কি হয়েছে নারদ?
বললে নারদ - কৈলাসটা ক্রমেই যেন হচ্ছে পাগলা গারদ।
ঘটনা কি তাই তোমাদের এবার আমি বলি
না হলে আবার জলের সাথে পেটে হবে গুলগুলি।
হিরো হন্ডা নিয়ে কার্ত্তিক বলল যে বাইবাই -
তোমার সাথে মা আমার আর দেখা হবে নাই।
মুখ ঘুরিয়ে, নথ নাড়িয়ে বললে এবার লক্ষ্মী
যাব না মা মর্ত্যে এবার নিয়ে পেঁচা পক্ষী।
ন্যানো করেই যাব এবার সোজা নিকোপার্ক
ন্যারো জিন্স পরে সবাইকে লাগিয়ে দেবোই তাক
ভুরু প্লাক করে এসে সরস্বতী বললে
মা, তুমি এবার নাইবা শাড়ি পড়লে
পাটিয়ালা পরেই আমি যাব যে মুম্বাই
তোমাকে তাই আজ থেকেই বললাম গুড বাই।
সুবোধ বালক, বললে গণেশ - মা আমি তোমার সঙ্গেই যাব
নইলে মিষ্টি, লাড্ডু, বোঁদে এসব কেমন করে পাব
আঁচল গুঁজে, খোঁপা উঁচিয়ে এলেন যে মা তেড়ে
কি ভাবছিস কি, তোদের আমি এত সহজে দেব ছেড়ে
অসুর আমার সঙ্গে যাবে, সঙ্গে যাবি তোরা
যতই না হোক অসুরের গায়ে ঘাম ঘামাচির ফোড়া
মহেশ এসে বললে এবার - শোন হে পার্বতী
টিন এজার ওরা সবাই তাই নেই কো কোন মতি
ভাবছি আমি জিন্স আর শার্ট পরে
দূরদেশেতে তুমি আমি যাবই এবার ট্যুরে।

With Best Compliments From :--

A
WELL
WISHER

SAMRAJIT MANNA

আমি হলাম ঢাকি

অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

ধাই-কুড়া কুড় নাক কুড়া কুড়
আমি হলাম ঢাকি
শহর থেকে অনেক দূরে
এক সে গাঁয়ে থাকি।

একে একে ছয়টি ঋতু
বিদায় নেবার পরে
শিউলি ফুলের গন্ধ মেখে
শরৎ আসে ঘরে।

মনটা বলে দুগ্গাপুজোর
আর দেরি নেই ভাই
এবার পুজোয় আগের মতই
ঢাক বাজানো চাই।

তখন আমার দুই চোখেতে
যায় যে ছুটে ঘুম,
আনন্দ ও উত্তেজনায়
ঢাক সারানোর ধূম।

ঢাক সারিয়ে ঝুলিয়ে কাঁধে
হই যে শহর মুখী
ঘরে অভাব তবু আমি
মনেতে নই দুখী।

মাটির বাড়ি খড়েরই চাল
বউ রইলো পড়ে
টাক ডুমা ডুম্ নাক ডুমা ডুম
ঢাকটি পেটাই জোরে।

বাপ বেটাতে ট্রেনে চড়ে
শহরেতেই আসি
আমি পুজোয় ঢাকটি বাজাই
ছেলে বাজায় বাঁশি।

তুমি কে

তপন কুমার ভৌমিক

বুঝতে পারিনা তুমি কে
জানতে চাইনা তুমি কি

শুধু জানি তুমি এক অন্য।
মান-হুঁশ, মানুষের মাঝে
আছে এক নতুন জগৎ
যাবে চলে, ঠিকানার ওপারে।

আসল কথাটা কি
ঠিক আছে, ভুলটাই বা কি
মানা-অমানা কি আসে যায়।

দিক দিগন্তে ছুটে যায় পাখি
আনে নতুন ঠিকানার সন্ধান
এখন হয়তো নীড়ে, কখনও বা আকাশে।

থমকে দাঁড়ানো পথিকও চলে যায়
এলোমেলো কিছু বলে যায়?
বাতাস থামেনা,নদী স্বভাবত বয়ে যায়।
কিছুতে পারিনা বুঝতে কে তুমি,
জানালেও যেন জানিনা;
তুমিও কি জান, তুমি কে?

তিনিই আমার

পূজা দাস

যার চোখেতে প্রথম দেখা
এই ধরাকে এসে,
আশার আলো দেখান যিনি
সব দুঃখেরই শেষে।
হাত ধরে যার পার হয়ে যাই
বিশাল জীবন মরু,
যার নামেতে জীবন পথে
পথ চলা হয় শুরু।
প্রয়োজনে কঠোর হয়ে
দন্ড যিনি দেন,
তিনিই আবার ভালোবেসে
কাছেও টেনে নেন।
দেশ বিদেশে সুখে দুঃখে
যেথায় রাখি পা,
যিনি হৃদয় মাঝে বিরাজ করেন
তিনিই আমার মা।

ADMISSION OPEN MPhil / PhD / Dip Engg / B.Tech / M.Tech

BBA / BCA / BSC (SOFT. ENGEG) IMCA / MBA (DUAL SP) / EXE MBA (1YR) / BSC / BA / BCom / MA / MCom / MSc / BLIS / MLIS / Dip Safety / PGDCA / BEd / DED / LLB / LLM

Dip. Engg can join Exe MBA (1yr.), MBA (4yr.), MCA (4yr.) B.Tech (3/4 yr.)
BSc can join M.Tech (3 yrs)
Fail X / XI / XII Now can join BA / BCom.

MORE THAN 500 COURSE AVAILABLE

ISO 9001:2008 CERTIFIED EDUCATION COMPANY, UNDER MCA GOVT OF INDIA

NIMTT

Head off Cum campus : L1/9, Vidyasagar Military Road, Baghajatin Hospital, Kolkata-17

AMTA BRANCH : 8016933515, 9434614125